স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে

স্বামী বিবেকানন্দ

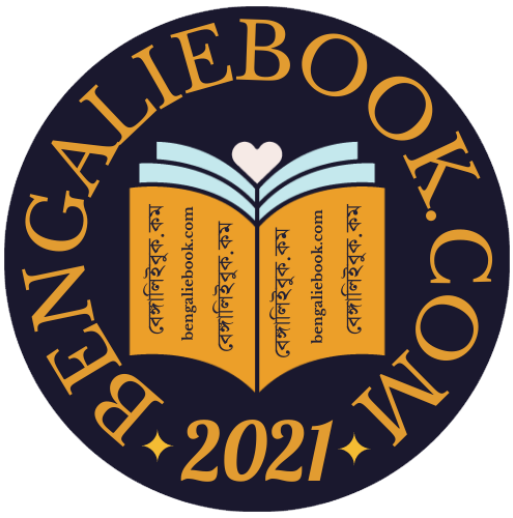

সূচিপত্র

০. অনুবন্ধ 2
১. আত্মা এবং ঈশ্বর 3
২. প্রাণায়াম 19
৩. যোগের মূল সত্য 30

০. অনুবন্ধ

খ্রীঃ ১৯০০ শতকের প্রথমার্ধে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সান্ ফ্রান্সিস্কো এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি শহরে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। তন্মধ্যে ১৭টি বক্তৃতা মিস্ আইডা আনসেল নাম্নী জনৈকা মহিলা সাঙ্কেতিক লিপিতে লিখিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ঐ লিপিসঙ্কেত তখন মাত্র শিখিয়াছেন, পারদর্শিতা জন্মে নাই। কাজেই স্বামীজীর কথা জায়গায় জায়গায় ছাড়িয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। মিস্ আনসেল নিজের অনুধ্যানের জন্যই স্বামীজীর বক্তৃতার সাঙ্কেতিক লিপি লইয়াছিলেন, লিপিগুলি বিস্তার করিয়া পূর্ণ বক্তৃতার আকারে প্রকাশ করিবার কোন সঙ্কল্প তাঁহার ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর লিপিগুলি তাঁহার নোটখাতার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবার পর অনেকের অনুরোধে দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্বে মিস্ আনসেল লিপিগুলি বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৭টি বক্তৃতা সম্পূর্ণ করিতে পারেন। এই অংশে অনূদিত বক্তৃতাগুলি মিস্ আইডা আনসেলের ঐ নোট হইতে প্রস্তুত। স্বামীজী যেমন যেমন বলিয়াছিলেন, লেখিকা হুবহু তাহা বজায় রাখিয়াছেন, ভাষা বা ব্যাকরণ সম্পাদনা করেন নাই। যে-সব স্থানে তিনি নিজে স্বামীজীর কতকগুলি কথা ধরিতে পারেন নাই, সেই জায়গাগুলি কয়েকটি বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ স্বামীজীর নিজের উক্তি নয়, তাঁহার কোন কথার সূত্র ধরিয়া দিবার জন্য লিপিকার কর্তৃক সম্বন্ধ।

অনুবাদকস্য

১. আত্মা এবং ঈশ্বর

২৩ মার্চ, ১৯০০ খ্রীঃ সান্ ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত।

মানুষকে সর্বপ্রথম যাহা তাহার নিজের অপেক্ষা উচ্চতর শক্তিসমূহের বিষয় চিন্তা করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল, উহা ভয় অথবা কৌতূহল, তাহা আমাদিগের আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই ভাবগুলি হইতে মানুষের মনে বিশেষ বিশেষ পূজার প্রবৃত্তি উদ্ভূত হইয়াছিল। মানবেতিহাসে এমন কোন সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যখন কোন না কোন প্রকার পূজার আদর্শ বর্তমান নাই। ইহার কারণ কি? কেন আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বাহিরে কোন কিছুর উপলব্ধির জন্য এত ব্যাকুল হই? মনোরম প্রভাতের স্পর্শেই হউক অথবা মৃত আত্মার ভয়েই হউক, কেন আমরা অতীন্দ্রিয়ের আবেশ অনুভব করি? ... প্রাগৈতিহাসিক যুগে যাইবার প্রয়োজন নাই, কেননা এই ব্যাপারটি দুই হাজার বৎসর আগেও যেমন ছিল, আজও সেইরূপ বর্তমান। আমরা এখানে পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া পাই না। যে অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন, প্রচুর ক্ষমতা এবং ধনৈশ্বর্য সত্ত্বেও কিসের যেন একটা অতৃপ্তি আমাদিগকে চঞ্চল করে।

বাসনা অনন্ত। উহার চরিতার্থ কিন্তু খুবই সীমাবদ্ধ। আমাদের চাওয়ার আর শেষ নাই, কিন্তু যাহা চাই তাহা যখন পাইতে যাই, তখনই সঙ্কট উপস্থিত হয়। আদিম মানুষের ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটিত। তাহার আকাঙ্ক্ষা যদিও ছিল স্বল্প, তবু উহা সে মিটাইতে পারিত না। এখন আমাদের শিল্প-বিজ্ঞানের কত উন্নতি ও বৈচিত্র্য হইয়াছে, তথাপি আমাদের চাহিদা দূর হইতেছে না। একদিকে বাসনা পরিপূর্তির উপায়গুলিকে আমরা নিপুণতর করিয়া চলিয়াছি, অপরদিকে বাসনাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে।

আদিমতম মানুষ যে-সব জিনিষ নিজে সম্পন্ন করিতে পারিত না, তাহাদের জন্য স্বভাবতই বাহির হইতে সাহায্য চাহিত। ... কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, অথচ উহা পাওয়া যাইতেছে না। অতএব বাহিরের শক্তিসমূহের সহায়তার দিকে তাহাকে তাকাইতে

হইত। সে-কালের সেই অজ্ঞ আদিম মানুষ আর বর্তমানের সুসভ্য মানুষ উভয়েই যখন ভগবানের কাছে কোন বাসনা-পরিপূর্তির জন্য মিনতি করিতেছে, তখন উভয়ে একই পর্যায়ে পড়ে। কোন পার্থক্য আছে কি? কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, না, বহু পার্থক্য আছে। কিন্তু আমার মনে হয় এই ধারণা ভুল। বস্তুতঃ অনেক সময়েই আমরা সমলক্ষণ ব্যাপারসমূহের মধ্যে মনগড়া প্রভেদ খাড়া করি। আদিম মানুষ ও সভ্য মানুষ একই শক্তির নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে। ঐ শক্তিকে তুমি ভগবান্ বা আল্লা বা যিহোবা যাহা খুশী বলিতে পার। মানুষ কিছু চায়, আর নিজের ক্ষমতায় যখন উহা আয়ত্ত করিতে পারে না, তখন কোন একজনের সাহায্য খুঁজে। এই প্রবৃত্তি আদিমকালে যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে। ... আমরা প্রত্যেকেই আদিম বর্বররূপে পৃথিবীতে আসি, ধীরে ধীরে নিজদিগকে সংস্কৃত করি। ... নিজেদের হৃদয় অন্বেষণ করিলে এখানে আমরা প্রত্যেকেই এই সত্যটি ধরিতে পারিব। এখনও আমাদের অসহায়তার ভয় কাটে নাই। বড় বড় কথা আমরা বলিতে পারি, দার্শনিক বলিয়া খ্যাতিও লাভ করিতে পারি, কিন্তু জীবনে যখন আঘাত আসে, তখন আমরা দেখিতে পাই, আমরা আমরা কত দুর্বল, আমাদের সাহায্যের কত প্রয়োজন! যত কিছু কুসংস্কার প্রচলিত আছে, আমরা সবগুলিতেই বিশ্বাস করিতে থাকি। অবশ্য এমন কোন কুসংস্কার পৃথিবীতে নাই, যাহার কিছু না কিছু সত্য ভিত্তি আছে। ধরুন আমি যদি সারা মুখ ঢাকিয়া শুধু নাকের ডগাটি দেখাই, তবুও উহা তো আমার মুখেরই একটি অংশ। কুসংস্কার সম্বন্ধেও এইরূপ। একটি বৃহৎ সত্যের ক্ষুদ্র অংশগুলিও তুচ্ছ নয়। দেখুন, মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া ব্যাপারটি হইতেই ধর্মের নিম্নতম বিকাশ ঘটিয়াছিল। ... প্রথমে মৃতদেহকে কাপড়ে জড়াইয়া ঢিবির ভিতর রাখিয়া দেওয়া হইত। মৃতব্যক্তির আত্মা রাত্রে আসিয়া ঢিবিতে বাস করে—ইহাই ছিল প্রচলিত বিশ্বাস। ... তারপর আরম্ভ হইল ভূমিতে মৃতদেহ প্রোথিত করিবার রীতি। ... কবরস্থানের দরজায় সহস্রদন্তী এক ভীষণা দেবী দাঁড়াইয়া! ... ইহার পর আসিল মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা। ধারণা ছিল চিতাগ্নির শিখা আত্মাকে ঊর্ধ্বলোকে লইয়া যায়। ... মিশরবাসীরা মৃতের জন্য খাদ্য এবং জল লইয়া যাইত।

ইহার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ভাব হইল গোষ্ঠীগত দেবতাদের ধারণা। একটি গোষ্ঠীর উপাস্য হইলেন এক দেবতা, অপর গোষ্ঠীর আরাধ্য অপর একজন দেবতা। য়াহুদী জাতির ঈশ্বর যিহোবা ছিলেন তাহাদের নিজস্ব জাতীয় দেবতা। ইনি অন্যান্য গোষ্ঠীর উপাসিত দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিতেন এবং তাঁহার আশ্রিত জাতির মঙ্গলের জন্য সব কিছু করিতে পারিতেন। তাঁহার আশ্রিত নয়—এমন একটি সমগ্র জাতিকেও যদি তিনি বিনষ্ট করিতেন, তাহাতে বলিবার কিছু ছিল না, তাহা ন্যায্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। তিনি কিছু দয়াও অবশ্য দেখাইতেন, কিন্তু সে করুণা একটি ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর প্রতিই সীমাবদ্ধ ছিল।

ক্রমশঃ উচ্চতর আদর্শ দেখা দিল। বিজেতা জাতির যিনি অধিপতি, তাঁহাকে সকল দলপতির উপরে স্থান দেওয়া হইল। তিনি হইলেন দেবতাদেরও দেবতা। ... পারসীকরা যখন মিশর জয় করে, তখন পারস্যের সম্রাটকে এইরূপ মনে করা হইত। দেব বা মানুষ কেহই তাঁহার সমকক্ষ নয়। এমন কি সম্রাটের দিকে দৃষ্টিপাত করা ছিল প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

ইহার পর দেখিতে পাই সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের ধারণা—যিনি সকল ক্ষমতার আধার, সর্বজ্ঞ এবং বিশ্বজগতের পালয়িতা। তাঁহার আবাসস্থান হইল স্বর্গ। মানুষের তিনিই বিশেষ আরাধ্য, সর্বাপেক্ষা প্রিয়, কেননা মানুষের জন্যই তিনি সব কিছুই সৃষ্টি করিয়াছেন। সারা পৃথিবী মানুষের ভোগের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। সূর্য, চন্দ্র, তারাসমূহ তাহারই জন্য।

এই-সব ধারণা যাহাদের, তাহাদের মন আদিম স্তরে রহিয়াছে, বলিতে হইবে। তাহাদের আদৌ সভ্য ও সংস্কৃত বলা চলে না। উচ্চতর ধর্মসমূহের প্রসার হয় গঙ্গা ও ইউফ্রাটিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। ভারতবর্ষের বাহিরে স্বর্গবাসী ঈশ্বর-ধারণার অতিরিক্ত ধর্মের আর কোন গভীরতর বিকাশ আমরা দেখিতে পাই না। ভারতের বাহিরে উচ্চতম ঈশ্বরীয় জ্ঞান বলিতে এ পর্যন্ত ইহাই পাওয়া গিয়াছে। ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া আছেন আর বিশ্বাসীরা মৃত্যুর পর তথায় যাইবে। ... আমার বিশ্লেষণে ইহাকে মানুষের একটি অত্যন্ত আদিম ধারণা বলা উচিত। আফ্রিকার মাম্বো-জাম্বো আর এই স্বর্গবাসী পিতা—একই কথা। তিনি জগৎকে চালিত করিতেছেন এবং অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা সর্বত্র পূর্ণ হইতেছে।

প্রাচীন হিব্রুরা স্বর্গকে গ্রাহ্য করিত না। যীশুখ্রীষ্টকে তাহাদের না মানিবার ইহাই ছিল অন্যতম কারণ, কেননা তিনি মৃত্যুর পর জীবনের কথা বলিতেন। সংস্কৃত ভাষায় স্বর্গ-শব্দের অর্থ এই পৃথিবীর অতীত স্থান। অতএব পৃথিবীর যত কিছু অশুভ সংশোধনের স্থান হইল স্বর্গ। আদিম মানুষ অশুভের পরোয়া করে না। অশুভ কেন থাকিবে, ইহা লইয়া সে প্রশ্ন তুলে না।

... শয়তান শব্দটি পারসীক। ... পারসীক এবং হিন্দুরা ধর্মের ক্ষেত্রে একই আর্য জাতির বিশ্বাসসমূহের উত্তরাধিকারী। তাহাদের ভাষাতেও ঐক্য ছিল—তবে এক জাতির ভাষায় 'শুভ'বাচক শব্দগুলি অপর জাতির ভাষায় 'অশুভ' বুঝাইত। 'দেব' শব্দটি একটি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ, উহার অর্থ ঈশ্বর। পারসীক ভাষায় উহার অর্থ হইল শয়তান।

পরে মানুষের ধর্মবিষয়ক চিন্তা আরও বিকাশপ্রাপ্ত হইলে নানা জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল। ঈশ্বরকে বলা হইতে লাগিল মঙ্গলময়। পারসীকদের মতে বিশ্বসংসারের অধীশ্বর দুই জন—একজন শুভ, অন্যজন অশুভ। প্রথমে সব কিছুই ছিল সুন্দর—চিরবসন্তযুক্ত মনোরম দেশ, মৃত্যুহীন জীবন, ব্যাধিহীন শরীর। অতঃপর আবির্ভাব হইল অশুভের অধিকর্তার। ইনি ভূমি স্পর্শ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আসিল ব্যাধি, মৃত্যু আবার মশক, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি 'অনিষ্টকারী' ও হিংস্র জন্তুসমূহ। অতঃপর আর্যগণ পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রাচীন আর্যেরা উত্তর অঞ্চলে বহুকাল ছিলেন। য়াহুদীরা শয়তানের ধারণা পারসীকদের নিকট হইতে পায়। পারসীকরাও শিক্ষা দিত যে, একদিন এই অশুভ ঈশ্বর বিনষ্ট হইবেন। আমাদের কর্তব্য হইল শুভ ঈশ্বরের পক্ষে থাকিয়া অশুভের অধীশ্বরের সহিত এই চিরন্তন সংঘর্ষে ঈশ্বরের শক্তি বৃদ্ধি করা। ... সমস্ত পৃথিবী ভস্মীভূত হইবে এবং প্রত্যেকেই একটি নূতন দেহ পাইবে।

পারসীকদের ধারণা ছিল মন্দ লোকেরাও একদিন পবিত্রতা লাভ করিবে, তখন তাহাদের আর অশুভ প্রবৃত্তি থাকিবে না। আর্যদের প্রকৃতি ছিল স্নেহমমতাময় ও কবিত্বপ্রবণ। সেজন্য তাহারা অনন্তকাল নরকাগ্নিতে দহনের কথা ভাবিতে পারিত না। মৃত্যুর পর মানুষের নূতন

শরীর হইবে। আর মৃত্যু হইবে না। ভারতের বাহিরে ধর্মের ধারণায় ইহাই হইল চরম উৎকর্ষ। উহার সহিত নৈতিক উপদেশও রহিয়াছে। মানুষের কর্তব্য তিনটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া—সচ্চিন্তা, সদ্‌বাক্য এবং সৎকার্য। এই মাত্র। ইহা একটি কার্যকর ও জ্ঞানগর্ভ ধর্ম। ইহার মধ্যে কিছু কবিত্বেরও আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু কবিত্ব ও চিন্তাধারার উচ্চতর পরিণতি আছে।

ভারতে বেদের প্রাচীনতম অংশে এই শয়তানের ঈষৎ প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তাহার প্রভাব থায়ী নয়, একবার দেখা দিয়াই সে যেন গা ঢাকা দিয়াছে। বেদে অশুভের জনক এই শয়তান যেন একটি প্রহার খাইয়া পলায়ন করিয়াছে। ভারত হইতে শয়তান যখন চলিয়া গেল, তখন পারসীকরা তাহাকে গ্রহণ করিল। আমরা তাহাকে পৃথিবী হইতে একেবারে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছি। পারসীকদের ধারণা লইয়া আমরা তাহাকে একটি সুসভ্য ভদ্রলোকে পরিণত করিতে চাই। তাহাকে আমরা একটি নব কলেবর দিব। ভারতের শয়তানের ইতিবৃত্ত এইখানে শেষ হইল।

কিন্তু পরমেশ্বরের ধারণা আগাইয়া চলিল। তবে এখানে আর একটি ঘটনা মনে রাখিতে হইবে। ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় প্রতাপের ধারণাও বাড়িয়া চলিয়া অবশেষে পারস্যসম্রাটের মহামহিমায় গিয়া ঠেকিয়াছিল। কিন্তু অন্যদিকে, তত্ত্ববিদ্যা ও দর্শনের উদ্ভব হইল। মানুষের আভ্যন্তরীণ সত্য—আত্মার ধারণা দেখা দিল এবং উহার ক্রমবিকাশ ঘটিতে লাগিল। ভারতবর্ষের বাহিরে অন্যান্য জাতির ঈশ্বরের ধারণা একটি বস্তুনিষ্ঠ আকারে গিয়া থামিয়াছিল। ভারত এই ধাপ খানিকটা অতিক্রম করিতে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। এই দেশে (আমেরিকায়) লক্ষ লক্ষ লোক বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরের একটি দেহ আছে। ... গোটা সম্প্রদায় এইরূপ বলে। তাহাদের ধারণা, ঈশ্বর সমগ্র জগতের শাসক, কিন্তু একটি বিশেষ স্থান আছে, যেখানে তিনি সশরীরে বাস করিতেছেন। তিনি একটি সিংহাসনের উপর বসিয়া আছেন। সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়, সেই রাজাধিরাজের উদ্দেশ্যে গান গাওয়া হয়—যেমন পৃথিবীর মন্দিরে আমরা করি।

ভারতে কিন্তু উপাসকদের যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান ছিল। যাহার ফলে তাহারা ঈশ্বরকে কখনও দেহধারী করিয়া তুলে নাই। ভারতে ব্রহ্মের কোন মন্দির দেখিতে পাইবে না। ইহার কারণ এই যে, আত্মার ধারণা ভারতে সর্বদাই বিদ্যমান ছিল। হিব্রুজাতি কখনও আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নাই। বাইবেলের 'পুরাতন সমাচারে' আত্মার কোন কথা পাওয়া যায় না। 'নূতন সমাচরে'ই উহা প্রথম দেখি। পারসীকরা ছিল আশ্চর্যরকমে করিতকর্মা, যুদ্ধপ্রিয়, বিজেতা জাতি। তাহারা যেন বর্তমান ইংরেজদের প্রাচীন সংস্করণ—প্রতিবেশী জাতিদের সহিত সর্বদা যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিতেছে। এই ধরনের ব্যাপারে তাহারা এত ব্যস্ত থাকিত যে, আত্মার সম্বন্ধে চিন্তা করিবার তাহাদের ফুরসত ছিল না।

আত্মার প্রাচীনতম ধারণা ছিল এই যে, উহা স্থূলদেহের অভ্যন্তরে একটি সূক্ষ্ম শরীর-বিশেষ। স্থূলদেহ বিনাশ পাইলে সূক্ষ্মদেহের আবির্ভাব ঘটে। মিশরদেশে বিশ্বাস ছিল যে, সূক্ষ্মদেহেরও মৃত্যু আছে। স্থূলদেহের বিকার ঘটিলে সূক্ষ্মদেহেরও বিশ্লেষ হইতে থাকে। এইজন্য মিশরের পিরামিড নির্মিত হইয়াছিল—যাহাতে মৃত ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে, এই আশায়। পিরামিডে রক্ষিত মৃতদেহকে আরক প্রভৃতির সহায়ে সতেজ রাখিবার চেষ্টা করা হইত।

ভারতবাসীদের মৃতদেহের প্রতি কোন দৃষ্টি নাই। তাহাদের ভাব এইঃ শবটিকে কোথাও লইয়া গিয়া পুড়াইয়া ফেলা যাক। পুত্রকে পিতার মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করিতে হয়।

মানুষ দুই প্রকৃতির—দৈব ও আসুর। যাহারা দৈব প্রকৃতির তাহারা নিজদিগকে চৈতন্যময় আত্মা বলিয়া ভাবে। আসুর প্রকৃতির মানুষ মনে করে তাহারা দেহ। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণ শিক্ষা দিতেন, শরীরের কোন অপরিণামী সত্তা নাই। 'কোন ব্যক্তি যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, মানবাত্মাও সেইরূপ জীর্ণদেহ ছাড়িয়া দিয়া আর একটি নূতন দেহ গ্রহণ করে।' আমার ক্ষেত্রে আমার পরিবেষ্টনী ও শিক্ষাদীক্ষা আমাকে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত দিকে লইয়া যাইবার জন্য উন্মুখ ছিল, কেননা আমি সদাই মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম। উহারা দেহের প্রতি অধিক মনোযোগী।

দেহ হইতে আত্মা তো মাত্র একটি ধাপ। ভারতে আত্মার আদর্শের উপর খুব ঝোঁক দেওয়া হইত। ঈশ্বরের ধারণার সহিত আত্মার ধারণা এক হইয়া গিয়াছিল! আত্মার ধারণাকে যদি প্রসারিত করা যায়, তাহা হইলে আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে আসিতেই হইবে যে, আত্মা নাম ও রূপের অতীত। ... ভারতীয় শিক্ষা হইল এই যে, আত্মা নাম নিরবয়ব। যাহা কিছুর আকৃতি আছে, তাহা কোন না কোন সময়ে বিনষ্ট হইবে। জড়ভূত ও শক্তির সমবেত কার্য বিনা কোন আকৃতির উদ্ভব হইতে পারে না। আর সকল সংহত বস্তুরই তো বিশ্লেষ অবশ্যম্ভাবী। অতএব তোমার আত্মার যদি নাম ও রূপ স্বীকার কর, তবে আর তুমি অমর নও, তুমি মৃত্যুর অধীন। আত্মা যদি স্থূল দেহের অনুরূপ একটি সূক্ষ্মদেহমাত্র হয়, তাহা হইলে আকৃতিমান্ বলিয়া উহা প্রকৃতির অন্তর্গত এবং প্রকৃতির জন্মমৃত্যুর নিয়মও উহার প্রতি প্রযুক্ত হইবে। ... ভারতের ঋষিরা উপলব্ধি করিয়াছেন—আত্মা মন নয়, সূক্ষ্মদেহও নয়।

চিন্তাসমূহ নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করা যায়। ... মনঃসংযমকে কতদূর লইয়া যাওয়া যায়, ভারতীয় যোগীরা তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে সাধনা করিয়াছেন। কঠোর অভ্যাস দ্বারা চিন্তার গতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চল করা যায়। মনই যদি মানুষের প্রকৃত স্বরূপ হইত, তাহা হইলে চিন্তার ঊর্ধ্বে মানুষের মৃত্যু ঘটিত। ধ্যানে চিন্তা বিলুপ্ত হয়, মনের উপাদানগুলিও সর্বতোভাবে স্তিমিত হইয়া যায়। রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও রুদ্ধ হয়, কিন্তু সাধকের তো মৃত্যু হয় না। যদি চিন্তা সমষ্টির উপর তাঁহার জীবন নির্ভর করিত, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থায় তাঁহার দেহ-মন-সংঘাতটির বিনাশই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহারা দেখিয়াছেন, ঐরূপ ঘটে না। ইহা পরীক্ষিত সত্য। অতএব তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে, মন ও মনের চিন্তারাশি প্রকৃত মানুষ নয়। বিচার করিয়াও দেখা গেল যে, মন কখনও মানুষের আত্মা হইতে পারে না।

আমি চলি, চিন্তা করি, কথা বলি। এই-সমস্ত কাজের মধ্যে একটি একতার সূত্র রহিয়াছে। চিন্তা ও কর্মরাশির অসংখ্য বৈচিত্র্য আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে অনুস্যূত অপরিবর্তনীয় একটি সত্তা বিরাজ করিতেছে। সেই সত্তা কখনও শরীর হইতে

পারে না। শরীর তো প্রতি মিনিটে পরিবর্তনশীল। উহা মনও হইতে পারে না, কেননা মনেও তো অজস্র নূতন নূতন চিন্তা সর্বদাই উঠিতেছে। ঐ একত্বের ভিত্তি শরীর-মনের যুগ্ম সংহতি, ইহাও বলা চলে না। শরীর, মন ও সংহতি প্রকৃতির অন্তর্গত এবং প্রকৃতির নিয়মের অধীন। মন যদি মুক্তই হয়, তাহা হইলে সে ...

অতএব যিনি প্রকৃত মানুষ, তিনি প্রকৃতির এলাকার মধ্যে নন। ইনি সেই অপরিবর্তনীয় চৈতন্যময় পুরুষ—যাহার দেহ ও মন অবশ্য প্রকৃতির অধীন। ইনি প্রকৃতিকে ব্যবহার করিতেছেন, যেমন তোমরা এই চেয়ারটি, এই কলমটি এবং এই কালিকে ব্যবহার কর। ইনিও সেইরূপ প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও স্থূল আকৃতিকে কাজে লাগাইতেছেন। স্থূল আকৃতি হইল দেহ, সূক্ষ্ম আকৃতি মন। ইনি নিজে নিরবয়ব, সর্বপ্রকার আকৃতিহীন। আকারসমূহ প্রকৃতিতে। প্রকৃতির পারে যিনি, তাঁহার স্থূল বা সূক্ষ্ম—কোন আকার থাকিতে পারে না। তিনি নিশ্চয়ই অরূপ। তাঁহাকে সর্বব্যাপীও হইতে হইবে। ইহা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। টেবিলের উপর এই গ্লাসটির কথা ধর। গ্লাস একটি আকার, টেবিলটিও একটি আকার। ইহারা যখন ভাঙিয়া যায়, তখন গ্লাসত্বের এবং টেবিলত্বের অনেকখানিই চলিয়া যায়।

আত্মার কোন রূপ নাই বলিয়া কোন নামও নাই। ইনি যেমন এই গ্লাসটির মধ্যে ঢুকিবেন না, সেইরূপ স্বর্গেও যাইবেন না, নরকেও নয়। যে আধারে ইনি বর্তমান, সেই আধারের রূপ ইনি গ্রহণ করেন। আত্মা যদি দেশে (space) না থাকেন, তাহা হইলে দুইটি বিকল্প সম্ভবপর। হয় তিনি দেশে অনুস্যূত অথবা দেশ তাঁহাতেই অবস্থিত। তোমার দেহ দেশে অবস্থান করিতেছে বলিয়া তোমার একটি আকার অবশ্যই প্রয়োজন। দেশ আমাদিগকে সীমাবদ্ধ করে, আমাদিগকে যেন বাঁধিয়া ফেলে এবং আমাদিগের উপর একটি আকৃতি চাপাইয়া দেয়। পক্ষান্তরে তুমি যদি দেশে অবস্থান না কর তো দেশ তোমাতেই বিদ্যমান। সকল স্বর্গ, সকল পৃথিবী সেই চৈতন্যময় পুরুষে অবস্থিত।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে বাধ্য। ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান। 'হস্ত না থাকিলেও তিনি সমস্ত বস্তু ধারণ করেন, পদবিহীন হইলেও তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন।' ... তিনি নিরাকার, মৃত্যুহীন, অনন্ত। ঈশ্বরের এইরূপ ধারণা বিকাশপ্রাপ্ত হইল। ... তিনি সকল আত্মার

অধীশ্বর, যেমন আমার আত্মা আমার এই দেহের অধিপতি। আমার আত্মা যদি দেহ ছাড়িয়া যান, তাহা হইলে দেহ এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারে না। সেইরূপ পরমাত্মা যদি আমার আত্মা হইতে বিযুক্ত হন, আত্মার অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। তিনি বিশ্বভুবনের স্রষ্টা, আবার যাহা কিছু ধ্বংস হইতেছে, তাহারও সংহর্তা তিনিই। জীবন তাঁহার ছায়া, মৃত্যুও তাঁহার ছায়া।

প্রাচীন ভারতের দার্শনিকগণ মনে করিতেন, এই কলুষিত পৃথিবী মানুষের সমাদরের যোগ্য নয়। কি ভাল, কি মন্দ—কিছুই এখানে চিরস্থায়ী নয়।

আমি পূর্বে বলিয়াছি, শয়তান ভারতে বেশী সুযোগ পায় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, ধর্মচিন্তায় ভারতবাসী খুব সাহসী ছিল। তাহারা ধর্মের ক্ষেত্রে অবোধ শিশুর ন্যায় আচরণ করিতে চায় নাই। শিশুদের বৈশিষ্ট্য তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? তাহারা সর্বদাই অপরের উপর দোষ চাপাইতে চায়। শিশুমন ভুল করিলে অন্য কাহাকেও দোষী করিতে তৎপর। একদিকে আমরা চেঁচাই—'আমাকে ইহা দাও, উহা দাও।' অন্যদিকে বলি—'আমি ইহা করি নাই। শয়তান আমাকে প্রলোভিত করিয়াছিল। সে-ই ইহার জন্য দায়ী।' ইহাই মানুষের ইতিহাস—দুর্বল মানবজাতির ইতিবৃত্ত!

মন্দ আসিল কেন? জগৎ একটি জঘন্য নোংরা গর্তের মত কেন? আমরাই ঐরূপ করিয়াছি। অন্য কেহ দোষী নয়। আমরাই আগুনে হাত দিয়াছি বলিয়া হাত পুড়িয়া গিয়াছে। ভগবান্ আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন। মানুষ যাহা পাইবার যোগ্য, তাহাই পায়। ভগবান্ তো করুণাময়। আমরা যদি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে নিশ্চয়ই সাহায্য করেন। তিনি তো নিজেকে আমাদের মধ্যে বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত।

ইহাই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী। ভারতবাসীর প্রকৃতি কাব্য-ঘেঁষা। কাব্যের জন্য তাহারা পাগল। তাহাদের দর্শনও কাব্য। যে দর্শনের কথা বলিতেছি, উহা একটি কবিতা। সংস্কৃত ভাষায় যাহা কিছু উচ্চচিন্তা, সবই কবিতায় লেখা। তত্ত্ববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা—সবই কাব্য।

হাঁ, আমরাই দায়ী। আমরা দুঃখ পাই কেন? বলিতে পার, 'আমি জন্মিয়াছি দুঃখী দরিদ্রের ঘরে। সারা জীবন কি কঠোর সংগ্রাম করিয়াছি, তাহা বেশ জানি।' দার্শনিকেরা ইহার উত্তরে বলিবেনঃ হাঁ, এই দুঃখভোগের জন্য তুমিই দায়ী। যে দুঃখ ও দারিদ্র্যের কথা বলিলে, উহা কি অকারণ ঘটিয়াছে বলিতে চাও? তুমি তো যুক্তিবাদী। তোমার জীবনের ঘটনাসমূহের কারণ-পরম্পরা রহিয়াছে। উহার কেন্দ্র তুমিই। তুমিই সর্বক্ষণ তোমার জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছ। ... স্বীয় জীবনের ছাঁচ তোমারই গড়া। তোমার জীবন-গতির জন্য তুমি নিজেই দায়ী। কাহাকেও দোষ দিও না, কোন শয়তানকে আসামী খাড়া করিও না। তাহাতে তোমারই শাস্তির মাত্রা বাড়িবে।

এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর ঈশ্বরের বিচার-সভায় হাজির করা হইল। ঈশ্বর তাহার শাস্তি ঠিক করিলেন—ত্রিশ ঘা বেত। অপর এক ব্যক্তি যে পৃথিবীতে নিজে কিছু উপলব্ধি না করিয়া ধর্মোপদেশ দিত, মৃত্যুর পর ঈশ্বরের বিচার-সভায় নীত হইলে ঈশ্বর হুকুম দিলেন—ইহার নিজের পাপের জন্য ত্রিশ ঘা বেত এবং অপরকে ভুল উপদেশ দিয়াছে বলিয়া আরও পনর ঘা বেত। ধর্মোপদেশ দেওয়ার এই বিপদ। আমার ভাগ্যে কি আছে, আমি জানি না। আমি তো পৃথিবীর সর্বত্র ধর্ম-বক্তৃতা করিয়া বেড়াই। যত লোক আমার উপদেশ শুনিয়াছে, প্রত্যেকের জন্য যদি আমাকে পনর ঘা বেত খাইতে হয়, তবে তো সমূহ বিপদ!২

আমাদিগকে এই ভাবটি বুঝিতে হইবে—ঈশ্বরের মায়া দৈবী। উহা তাঁহার ক্রিয়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, 'আমার এই দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাহারা আমার শরণ লয়, তাহারা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে।' আমরা দেখিতে পাই যে, নিজেদের চেষ্টায় এই মায়ার মহাসমুদ্র পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন; একপ্রকার অসম্ভব। সেই পুরাতন মুরগী ও ডিমের প্রশ্ন—কোন্‌টি আগে? যে-কোন কর্ম কর, উহা ফল প্রসব করিবে। কর্মটি কারণ, ফলটি হইল কার্য। কিন্তু ফলটি আবার তোমাকে নূতন কর্মে প্রবৃত্ত করে। এখানে ফলটি হইল কারণ, নূতন কর্মটি হইল কার্য। এইভাবে কার্য-কারণ-পরম্পরা চলিতে থাকে। একবার গতি আরম্ভ হইলে উহার আর বিরতি ঘটে না। ভাল বা মন্দ কোন কাজ

করিলে উহার ক্রিয়া শুরু হইয়া যাইবে। উহা থামাইবার উপায় নাই। অতএব এই কর্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অতি কঠিন। কার্য-কারণের নিয়ম অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী যদি কেহ থাকেন এবং তিনি যদি আমাদের উপর প্রসন্ন হন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে কর্মচক্রের বাহিরে টানিয়া আনিতে পারেন।

আমরা বলি, এইরূপ একজন আছেন। তিনি ঈশ্বর—অসীম করুণাময়। তিনি আছেন বলিয়াই আমাদের মুক্তি সম্ভব। নিজের ইচ্ছাতে কি তুমি মুক্ত হইতে পার? 'ঈশ্বর-কৃপায় মুক্তি'—এই মতবাদের অন্তর্নিহিত দর্শন বুঝিতে পারিতেছ কি? তোমরা পাশ্চাত্যবাসীরা খুব নিপুণ-বুদ্ধি—কিন্তু যখন তোমরা দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে বস, তখন সবই বড় জটিল করিয়া তোল। মুক্তি অর্থে যদি প্রকৃতির বাহিরে যাওয়া বুঝায়, তাহা হইলে কর্ম দ্বারা তোমরা কি করিয়া মুক্তিলাভ করিবে? মুক্তির অর্থ ঈশ্বরে অবস্থান। ইহা তখনই সম্ভব, যখন তুমি নিজের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পার—যে আত্মা প্রকৃতি ও তাহার যাবতীয় বিকার হইতে পৃথক্। এই আত্মাই ঈশ্বর—বিশ্বপ্রকৃতি এবং জীবনসমূহের মধ্যে ওতপ্রোত।

আমার ব্যষ্টি আত্মার সহিত আমার শরীরের যে সম্পর্ক, পরমাত্মার সহিত ব্যষ্টি আত্মাসমূহেরও সেই প্রকার সম্বন্ধ। আমরা ব্যষ্টিরা হইলাম পরমাত্মার দেহ। ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি—তিনই এক। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, কার্য-কারণের নিয়ম প্রকৃতির প্রতিটি অংশে পরিব্যাপ্ত। প্রকৃতির ফাঁসে একবার আটকাইয়া পড়িলে আর বাহির হইয়া আসা যায় না। কার্য-কারণের নিয়মে একবার বদ্ধ হইলে সম্ভাব্য পরিত্রাণ তোমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম দ্বারা হইবার নয়। জগতের প্রত্যেকটি মাছির জন্য তোমরা হাসপাতাল নির্মাণ করিতে পার ...এরূপ সৎকর্ম কখনই তোমাদিগকে মুক্তি দিবে না। এই-সব লোকহিতকর কীর্তিকলাপ গড়ে আবার ভাঙে। মুক্তিলাভ সম্ভবপর যদি এমন কেহ থাকেন যিনি কখনও প্রকৃতিতে বাঁধা পড়েন নাই, যিনি প্রকৃতির অধীশ্বর। প্রকৃতি তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, তিনিই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন। নিয়ম তাঁহাকে চালিত করে না, তাঁহারই ইচ্ছায় নিয়ম চালু হয়। ... তিনি নিত্য বর্তমান, তাঁহার করুণার অন্ত নাই। যে মুহূর্তে তুমি

তাঁহাকে ঠিক ঠিক খুঁজিবে, সেই মুহূর্তেই তিনি তোমাকে মুক্ত করিবেন। কেননা তিনিই যে তোমার প্রকৃত স্বরূপ।

কেন পরমাত্মা আমাদিগকে উদ্ধার করেন নাই? আমরা তাঁহাকে চাই নাই বলিয়া। আমরা তাঁহাকে ছাড়া অন্য সব কিছু চাই। তাঁহার জন্য যখনই প্রগাঢ় ব্যাকুলতা জাগিবে, তখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আমরা ভগবানকে বলি, 'প্রভু, আমাকে একটি সুন্দর বাড়ী দাও, আমাকে স্বাস্থ্য দাও, এই বিপদটি কাটাইয়া দাও' ইত্যাদি। মানুষ যখন তাঁহাকে ছাড়া আর কিছুই চায় না, তখনই তিনি দেখা দেন। একটি ভক্তের প্রার্থনাঃ

'হে প্রভু, ধনী ব্যক্তির স্বর্ণ রৌপ্যের এবং অন্যান্য সম্পত্তির উপর যেমন প্রীতি, তোমার প্রতি আমার সেইরূপই ভালবাসা যেন জাগে। আমি পৃথিবী বা স্বর্গের সুখ চাই না, রূপ-যৌবন চাই না, বিদ্যা-গৌরব চাই না। মুক্তিও চাই না। বার বার যদি নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও আমার ভয় নাই। কিন্তু আমার কাম্য শুধু একটি বস্তু—তোমাকে ভালবাসা—ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—যাহার নিকট স্বর্গ অতি তুচ্ছ।'

মানুষ যাহা চায়, তাহাই পায়। যদি সর্বদা শরীরের ধ্যান কর, পুনরায় শরীর ধারণ করিতে হইবে। এই শরীরটি গেলে আবার একটি আসিবে, একটির পর একটি শরীর-পরিগ্রহ চলিতে থাকিবে। জড়ভূতকে ভালবাসিলে জড়ভূতেই আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। প্রথমে আসে পশুজন্ম। একটি কুকুরকে যখন হাড় কামড়াইতে দেখি, তখন বলি, 'ভগবান্, আমাদিগকে রক্ষা করুন—যেন কুকুর-জন্ম না হয়!' অত্যন্ত দেহাসক্তির পরিণাম কুকুর বিড়াল হইয়া জন্মান। আরও যদি অবনত হও, তাহা হইলে খনিজ প্রস্তরাদি হইবে—শুধু জড়পিণ্ড, আর কিছু নয়।

অপর অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কোন আপস করিতে যাইবেন না। সত্যকে ধরিয়াই মুক্তিপথে যাওয়া যায়। ইহা হইল আর একটি মূলমন্ত্র। ...

মানুষ যখন শয়তানকে লাথি মারিয়া দূর করিয়া দিল, তখনই তাহার যথার্থ আধ্যাত্মিক উন্নতি শুরু হইল। সে সাহসের সহিত খাড়া হইয়া দাঁড়াইল এবং সংসারের দুঃখকষ্টের

দায়িত্ব নিজেরই স্কন্ধে লইল। পক্ষান্তরে যখনই সে ভূত-ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়াছে এবং কার্য-কারণের নিয়ম লইয়া মাথা ঘামাইয়াছে, তখনই তাহাকে নতজানু হইয়া কাঁদিয়া বলিতে হইয়াছে, 'প্রভু, আমাকে বাঁচাও। তুমিই তো আমাদের স্রষ্টা ও পিতা, আমাদের পরম বন্ধু।' ইহা কাব্য, তবে আমার মনে হয়, খুব উৎকৃষ্ট কাব্য নয়। ইহা যেন অনন্তকে রূপায়িত করা। প্রত্যেক ভাষায় এইরূপ অসীমকে রূপায়িত করিবার নিদর্শন আছে। কিন্তু এই অনন্ত যথার্থ অনন্ত নন—ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়-স্পৃষ্ট অনন্ত—আমাদের মাংসপেশী-বিধৃত অনন্ত। ...

' তাঁহাকে সূর্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র বা তারকারাজি বা বিদ্যুৎও নয়।'৩ ইহা অনন্তের আর একপ্রকার চিত্রণ—নিষেধাত্মক ভাষায়। ... উপনিষদের অধ্যাত্মবাদে অনন্তকে এইভাবে চরম বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদান্ত পৃথিবীর শুধু শ্রেষ্ঠ দর্শনই নয়, ইহা শ্রেষ্ঠ কাব্যও বটে। ...

এখন ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও, বেদের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মধ্যে পার্থক্য হইল এইঃ প্রথম ভাগের বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎ। বহির্জগতের আনন্ত্য, প্রকৃতি ও প্রকৃতির অধিকর্তা—ইহা লইয়াই বেদের প্রথম ভাগের ধর্মকর্ম। দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ বেদান্তের অন্বেষ্টব্য ভিন্ন। এখানে মানব-মনীষা ঐ-সকলকে ছাড়াইয়া গিয়া অভিনব আলোকের সন্ধান পাইয়াছে। দেশগত আনন্ত্যে সে তৃপ্তি পায় নাই। উপনিষদের ঘোষণাঃ 'স্বতঃবর্তমান পরমাত্মা মানুষের ইন্দ্রিয়নিচয়কে বহির্মুখ করিয়া গড়িয়াছেন। যাহাদের দৃষ্টি বাহিরে, তাহারা আন্তর সত্যের সন্ধান পায় না। তবে এমন কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা সত্যকে জানিবার ইচ্ছায় নিজেদের দৃষ্টি ভিতরের দিকে ফিরাইয়া দিয়া অন্তরের অন্তরে প্রত্যাগাত্মার মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন।' ৪

আত্মার আনন্ত্য দেশগত আনন্ত্য নয়, এই আনন্ত্যই যথার্থ আনন্ত্য—উহা দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে। ... পাশ্চাত্য এই দেশকালাতীত অধ্যাত্মজগতের সন্ধান পায় নাই। ...তাহাদের মন বহিঃপ্রকৃতি এবং উহার অধীশ্বরের দিকেই নিয়োজিত। আপন অন্তরে তাকাইয়া হারান সত্যকে খুঁজিয়া বাহির কর। এই সংসার-স্বপ্ন হইতে মন কি দেবতাদের সহায়তা বিনা

জাগিয়া উঠিতে পারে? একবার যদি সংসারের চাকা ঘুরিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে কৃপাময় পরমপিতা আমাদিগকে উহা হইতে বাহির করিয়া না আনিলে আমাদের উপায় নাই।

তবে করুণাময় ভগবানের নিকট গেলেও উহা চরম মুক্তি হইবে না। দাসত্ব দাসত্বই।সোনার শিকলও লোহার শিকলের ন্যায়ই বিপজ্জনক। নিষ্কৃতির পথ আছে কি?

না, তুমি বদ্ধ নও। কেহই কোন কালে বদ্ধ ছিল না। আত্মা সংসারের অতীত। আত্মাই সব। তুমিই সেই এক। দুই নাই। ঈশ্বর হইলেন মায়ার পর্দায় তোমারই প্রতিবিম্ব। আত্মাই প্রকৃত ঈশ্বর। মানুষ যাঁহাকে অজ্ঞানবশে পূজা করে, তিনি আত্মারই প্রতিবিম্ব। স্বর্গবাসী পিতাকে ভগবান্ বলা হয়। কিন্তু ভগবানের ভগবত্তা কিসে? তিনি তোমার নিজেরই প্রতিবিম্ব বলিয়া সর্বদা যে তুমি ভগবানকে দেখিতেছ, ইহা বুঝিতে পারিলে কি? তোমার যত বিকাশ ঘটে, সেই প্রতিবিম্বও তত স্পষ্টতর হইতে থাকে।

‘ একই বৃক্ষে দুইটি সুন্দর পাখী৫ বসিয়া আছে। উপরের পাখীটি হইল স্থির, শান্ত, গম্ভীর। নীচেরটি কিন্তু সদা চঞ্চল–মিষ্ট ও তিক্ত ফল খাইয়া কখনও সুখী, কখনও দুঃখী।–জীবাত্মারূপী নীচের পাখীটি যখন পরমাত্মারূপী উপরের পাখীটিকে নিজের স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারে, তখনই তাহার দুঃখের অবসান হয়।’

… ‘ঈশ্বর’ বলিও না; ‘তুমি’ বলিও না; বল ‘আমি’। দ্বৈতবাদের ভাষা হইল–‘হে ঈশ্বর, তুমি আমার পিতা।’ অদ্বৈতের ভাষা হইলঃ ‘আত্মা’ আমার নিজের অপেক্ষাও প্রিয়। অন্তরতম সত্যের কোন নাম আমি দিব না। নিকটতম শব্দ যদি কিছু থাকে, তাহা ‘আমি’ ।
…

‘ঈশ্বরই সত্য। জগৎ স্বপ্নমাত্র। ধন্য আমি যে, আমি এই মুহূর্তে জানিতেছি–আমি চিরকালই মুক্ত ছিলাম, চিরকালই মুক্ত থাকিব। আমি যে পূজা করিতেছি, আমিই উহার লক্ষ্য। প্রকৃতি বা অজ্ঞান কোন কিছুই আমাকে অভিভূত করে নাই। প্রকৃতি আমা হইতে তিরোহিত, দেবতারা আমা হইতে তিরোহিত, পূজা … কুসংস্কার সবই আমা হইতে

তিরোহিত। আমি আমাকে জানিতেছি। আমিই সেই অনন্ত। ইনি অমুক ভদ্রলোক, ইনি অমুক মহিলা; দায়িত্ব, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সব বুদ্ধিই লয় পাইয়াছে। আমিই সেই ভূমা। আমার মৃত্যু কি সম্ভবপর, অথবা জন্ম? কাহাকে আমি ভয় করিব? আমিই সেই এক। আমি কি নিজেকে ভয় করিব? অপর কে আছে, যাহা হইতে ত্রাস জন্মিবে? একমাত্র সত্তা আমিই। অপর কিছু নাই। আমিই সব।'

চাই শুধু নিজের চিরমুক্ত স্বরূপের স্মৃতি। কর্ম-সম্পাদ্য মুক্তি খুঁজিও না। ঐ মুক্তি কখনও পাওয়া যায় না। তুমি যে বরাবরই মুক্ত রহিয়াছ।

আবৃত্তি করিয়া চল—'মুক্তোঽহম্'। যদি পরমুহূর্তে মোহ আসে এবং বলিতে হয় 'আমি বদ্ধ'—তাহাতেও পিছাইও না। এই গোটা সম্মোহনটিকেই দূর করিয়া দাও।

এই তত্ত্ব প্রথমে শুনিতে হয়। শুনিয়া দিনের পর দিন উহা চিন্তা করিতে থাক। অহোরাত্র মন এই ভাবনা দ্বারা পরিপূর্ণ রাখ।

'আমিই ঐ পরম সত্য। আমিই বিশ্বের অধিপতি। মোহ কখনও ছিল না।' মনের সকল শক্তি দিয়া এইভাবে ধ্যান করিতে থাক, যত দিন না বাস্তবিক প্রত্যক্ষ কর যে, এই দেওয়ালগুলি, গৃহগুলি, চারিদিকের সব কিছু গলিয়া যাইতেছে, শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় বিষয় অদৃশ্য হইতেছে। 'একাকী আমি দাঁড়াইয়া থাকিব। আমি সেই এক।' চেষ্টা করিয়া চল। ভাবনা কিসের? আমরা চাই মুক্তি; অলৌকিক শক্তি আমাদের কাম্য নয়। সকল পৃথিবী আমরা ত্যাগ করিলাম; সকল স্বর্গ, সকল নরক আমরা তুচ্ছ করিলাম। অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা, এই ঐশ্বর্য, অমুক বিভূতি—এ-সকল লইয়া আমি কি মাথা ঘামাইব? মন বশীভূত হইল কি না হইল—তাহাতেই বা আমার কি আসে যায়? মন যদি দৌড়াইতে চায়, দৌড়াক। আমি তো মন নই, সে যথা রুচি চলুক।

সৎ অসৎ দুয়েরই উপর সূর্য সমভাবে কিরণ দেয়। কাহারও চোখের দোষের জন্য সূর্যের কি কোন হানি হয়? 'সোঽহম্'। মন যাহা কিছু করে, তাহা আমাকে স্পর্শ করে না।

অপরিচ্ছন্ন স্থানে সূর্যের আলোক পড়িলে সূর্য তো তাহা দ্বারা অপবিত্র হয় না। আমি সৎস্বরূপ।

ইহাই হইল অদ্বৈত-দর্শনের ধর্ম। ইহা কঠিন। কিন্তু সাধন করিয়া চল। সকল কুসংস্কার দূর করিয়া দাও। গুরু বা শাস্ত্র বা দেবতা বিদায় হউন। মন্দির, পুরোহিত, প্রতিমা, অবতার—এমন কি ঈশ্বরকে পর্যন্ত বিদায় দাও। ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন, সে ঈশ্বর আমিই। সত্যান্বেষী দার্শনিকগণ, উত্তিষ্ঠত। অভীঃ। ঈশ্বর ও জগৎরূপ কুসংস্কারের কথা বলিও না। 'সত্যমেব জয়তে।' আর ইহাই সত্য। আমিই অনন্ত।

ধর্মের কুসংস্কারসমূহ অসার কল্পনামাত্র ...। এই সমাজ—এই যে আমি তোমাদিগকে সম্মুখে দেখিতেছি, তোমাদের সহিত কথা বলিতেছি—এ সবই মিথ্যা প্রতীতি। এ সবই ত্যাগ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ, তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক হইতে গেলে কি প্রয়োজন হয়! এই সাধনপ্রণালীকে জ্ঞানযোগ বলে—জ্ঞান বিচারের পথ। অন্যান্য পথ সহজ ও মন্থর ... কিন্তু জ্ঞানপথে প্রচণ্ড মনের বল আবশ্যক। দুর্বল ব্যক্তির জন্য ইহা নয়। তোমার বলা চাইঃ

'আমি আত্মা—নিত্যমুক্ত; আমার কখনও বন্ধন ছিল না। কাল আমাতে বিদ্যমান, আমি কালে নই। আমারই মনে ঈশ্বরের জন্ম। যাঁহাকে পিতা ঈশ্বর অথবা বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর বলা হয়, তিনি আমারই মানস-সৃষ্ট।'

তোমরা যদি নিজেদের দার্শনিক বল তো কাজে উহা দেখাও। এই পরম সত্যের অনুধ্যান ও আলোচনা কর। পরস্পর পরস্পরকে এই পথে সাহায্য কর এবং সকল প্রকার কুসংস্কার বর্জন কর।

২. প্রাণায়াম

২৮ মার্চ, ১৯০০ খ্রীঃ সান্ ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ-অভ্যাস জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া আসিতেছে। এমন কি ইহা মন্দিরদর্শন বা স্তবস্তোত্রাদি পাঠের মত ধর্মচারণের একটি অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে। ... আমি এই বিষয়ের প্রতিপাদ্যগুলি তোমাদের নিকট উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব।

তোমাদিগকে আমি বলিয়াছি, ভারতীয় দার্শনিক কিভাবে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দুটি বস্তুতে পর্যবসিত করেন—প্রাণ ও আকাশ। প্রাণ-অর্থে শক্তি। যাহা কিছু গতি বা সম্ভাব্য গতি, চাপ, আকর্ষণ ... বিদ্যুৎ, চুম্বকশক্তি, শরীরের ক্রিয়ানিচয়, মনের স্পন্দন প্রভৃতি-রূপে প্রকাশ পাইতেছে, সবই সেই এক মূলশক্তি প্রাণের অভিব্যক্তি। প্রাণের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইল—যাহা মস্তিষ্কে বুদ্ধির আলোকরূপে অভিব্যক্ত।

শরীরে প্রাণের যত কিছু অভিব্যক্তি, তাহার প্রত্যেকটিকে মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। ... শরীরকে সম্পূর্ণভাবে মনের অধিকারে আনা চাই। আমাদের সকলের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়; বরং আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে ইহার বিপরীতটিই সত্য। যাহা হউক আমাদের লক্ষ্য হইল—মনকে এমনভাবে তৈরী করা, যাহাতে খুশীমত সে শরীরের প্রত্যেক অংশ শাসন করিতে পারে। ইহাই তত্ত্ববিচার ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী। অবশ্য আমরা বাস্তব-ক্ষেত্রে যখন আসি, তখন ইহা খাটে না। তখন আমরা গাড়ীটিকে ঘোড়ার আগে স্থাপন করিয়া বসি। শরীরই তখন মনের উপর কর্তৃত্ব করে। আঙুলে কেহ চিমটি কাটিলে আমি যন্ত্রণা বোধ করি। দেহেরই প্রভাব মনের উপর চলিতে থাকে। দেহে অবাঞ্ছনীয় কিছু ঘটিলে আমার দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না, আমার মনের সাম্যচ্যুতি ঘটে। এই অবস্থায় শরীরই আমাদের মনের প্রভু। আমরা দেহের সহিত এক হইয়া যাই। নিজদিগকে শরীর ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারি না।

তত্ত্বদর্শী আসিয়া আমাদিগকে এই দেহাত্মবুদ্ধির বাহিরে যাইবার পথ দেখান। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দেন। তবে যুক্তিবিচার দ্বারা বুদ্ধিতে ইহা ধারণা করা ও স্বরূপের প্রত্যক্ষানুভূতি—এই দুই-এ সুদীর্ঘ ব্যবধান রহিয়াছে, যেমন একটি বাড়ীর নক্সা ও বাস্তব বাড়ীটির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকে। অতএব ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য নানা প্রণালী থাকা চাই। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা তত্ত্বজ্ঞানের পন্থা অনুশীলন করিতেছিলাম—আত্ম-স্বরূপে দাঁড়াইয়া সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করা—আত্মার মুক্তস্বভাব ঘোষণা করা—শরীরের সাহায্য না লইয়া শরীরকে জয় করা। গীতা বলেন, ইহা খুবই কঠিন। সকলের জন্য এই পথ নয়। দেহাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই সাধনা দুষ্কর। (গীতা, ১২ । ৫)

কিছু স্থূল সহায়তা পাইলে মন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। মন নিজেই এই চরম আধ্যাত্মিক সত্যের অনুভূতি যদি সম্পাদন করিতে পারে, তাহা হইলে তদপেক্ষা সঙ্গত আর কিছু আছে কি? কিন্তু দুঃখের বিষয়, মন তাহা পারে না। আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে স্থূল সাহায্যের প্রয়োজন হয়। রাজযোগের প্রণালী হইল—এই স্থূল সাহায্যগুলি গ্রহণ করা। উহা আমাদের শরীরের ভিতর যে-সব শক্তি ও সামর্থ্য রহিয়াছে, সেগুলিকে কাজে লাগাইয়া কতকগুলি উন্নত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করে এবং মনকে উত্তরোত্তর সবল করিয়া উহাকে তাহার হৃত সাম্রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তিতে সহায়তা করে। কেবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া কেহ যদি চরম আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা তো অতি উত্তম। কিন্তু আমরা অনেকেই তো উহা পারি না। সেজন্য আমাদিগকে স্থূল সাহায্য অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ ইচ্ছাশক্তিকে লক্ষ্যপথে লইয়া যাইতে হইবে।

... সমগ্র জগৎ হইল বহুত্বে একত্বের একটি বিপুল নিদর্শন। মাত্র এক সমষ্টি মন রহিয়াছে। উহারই বিভিন্ন অবস্থা বিভিন্ন নামে পরিচিত। মনরূপ মহাসমুদ্রে ঐগুলি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত। আমরা একই সময়ে সমষ্টি ও ব্যষ্টি। এইভাবে খেলা চলিতেছে ...। বাস্তবপক্ষে একত্বের কখনও বিচ্যুতি ঘটে না। জড় পদার্থ, মন এবং আত্মা—তিন-ই এক।

এই-সকল বিভিন্ন নাম মাত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু একটিই সত্য আছে, পৃথক্ দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা উহাকে প্রত্যক্ষ করি। একটি দৃষ্টিকোণে উহা জড়বস্তুরূপে প্রতীত হয়, অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে উহাকেই দেখি মনরূপে, দুই বস্তু কিছু নাই। একজন একটি দড়িকে সাপ বলিয়া ভুল করিয়াছিল। ভয়ে অস্থির হইয়া সে অপর একজনকে সাপটিকে মারিবার জন্য ডাকিতে লাগিল। তাহার স্নায়ুমণ্ডলীতে কম্পন শুরু হইল, বুক ধড়াস ধড়াস করিতে আরম্ভ করিল। ভয় হইতেই এই-সব লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। অবশেষে সে যখন আবিষ্কার করিল, উহা দড়ি, তখন সব বিকার চলিয়া গেল। আমরাও চিরন্তন সত্য-বস্তুকে এইরূপ নানা মিথ্যা আকারে দেখিতেছি। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, আমরা যাহাকে জড় পদার্থ বলি, উহাও সেই সৎস্বরূপ। তবে আমরা যেভাবে দেখিতেছি, উহা তাহা নয়। যে-মন দড়ি দেখিয়া উহাকে সাপ বলিয়া ভাবিয়াছিল, সে-মন যে মোহগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা নয়; তাহা হইলে সে কিছুই দেখিত না। একটি জিনিষকে অপর জিনিষ বলিয়া দেখা, একেবারে যাহার অস্তিত্ব নাই—এমন কিছু দেখা নয়। আমরা শরীর দেখিতেছি, অনন্তকে জড়বস্তু বলিয়া মনে করিতেছি। আমরা সত্যেরই সন্ধান করিতেছি। আমরা কখনও প্রবঞ্চিত নই। সর্বদাই আমরা সত্যকেই জানিতেছি, তবে সত্যের প্রতিচ্ছবি কখনও কখনও আমাদের কাছে ভুল হইতেছে, এই মাত্র। একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে কেবল একটি বস্তুকেই দেখা চলে। যখন আমি সর্পকে দেখিতেছি, রজ্জু তখন সম্পূর্ণ তিরোহিত। আবার যখন রজ্জু দেখি, তখন সর্প আর নাই। এক সময়ে একটি মাত্র বস্তু প্রত্যক্ষ হইতে পারে।

আমরা যখন জগৎ দেখিতেছি, তখন ঈশ্বরকে দেখিব কিরূপে? ইহা মনে মনে বেশ ভাবিয়া দেখ। 'জগৎ' অর্থে ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে বহু বস্তুরূপে প্রতীয়মান ঈশ্বরই। যখন তুমি সাপ দেখিতেছ, তখন দড়ি আর নাই। যখন চৈতন্য সত্তার বোধ হইবে, তখন অপর যাহা কিছু সব লোপ পাইবে। তখন আর জড়বস্তুকে দেখিবে না, কেননা যাহাকে জড়বস্তু বলিতেছিলে, তাহা চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয়ই বহুর 'অধ্যাস' লইয়া আসে।

জলাশয়ের সহস্র সহস্র তরঙ্গে একই সূর্য প্রতিবিম্বিত হইয়া সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র সূর্যের সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন আমি ব্রহ্মাণ্ডের দিকে তাকাই, তখন উহাকে জড়বস্তু ও শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যান করি। একই সময়ে উহা এক ও বহু। বহু এককে নষ্ট করে না, যেমন মহাসমুদ্রের কোটি কোটি তরঙ্গ সমুদ্রের একত্বকে কখনও ব্যাহত করে না। সর্বদা উহা সেই এক মহাসমুদ্র। যখন জগৎকে দেখিতেছ, মনে রাখিও—আমরা উহাকে জড় বা শক্তি দুইয়েতেই পরিণত করিতে পারি। আমরা যদি কোন বস্তুর বেগ বাড়াইয়া দিই, উহার ভর (mass) কমিয়া যায় ...। পক্ষান্তরে ভর বৃদ্ধি করিলে বেগ হ্রাস পায়। ... এমন একটি অবস্থায় প্রায় পৌঁছান যাইতে পারে, যেখানে বস্তুর ভর সম্পূর্ণ লোপ পাইবে।

জড়কে শক্তির কারণ অথবা শক্তিকে জড়ের কারণ বলা চলে না। উভয়ের সম্পর্ক এমন যে, একটি অপরটির মধ্যে তিরোহিত হয়। একটি তৃতীয় পক্ষ অবশ্যই থাকা প্রয়োজন, উহাই মন। বিশ্বজগৎকে জড় বা শক্তি কোনটি হইতেই উৎপন্ন করা যায় না। মন জড় নয়, শক্তিও নয়, অথচ সর্বদাই জড় ও শক্তির প্রসব করিতেছে। আখেরে মন হইতেই সকল শক্তির উদ্ভব। 'বিশ্ব-মন'—এর অর্থ ইহাই—সকল ব্যষ্টি-মনের সংহতি। প্রত্যেক ব্যষ্টি-মন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, আর সব সৃষ্টি একত্র যোগ করিলে অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চ খাড়া হয়। বহুত্বে একত্ব—একই সময়ে বহু ও এক।

ব্যক্তি-ঈশ্বর হইলেন সকল জীবের সমষ্টি, আবার তাঁহার একটি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যও আছে—যেমন আমাদের দেহ অসংখ্য কোষের সমষ্টি, কিন্তু গোটা দেহটির একটি পৃথক্ স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে।

যাহা কিছুর গতি আছে, উহা প্রাণ বা শক্তির অন্তর্গত। এই প্রাণই নক্ষত্র সূর্য চন্দ্রকে ঘুরাইতেছে; প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ ... ।

অতএব প্রকৃতির যাবতীয় শক্তিই বিশ্বমনের সৃষ্টি। আর আমরা ঐ বিশ্ব-মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশরূপে ভূমাপ্রকৃতি হইতে প্রাণকে আহরণ করিয়া নিজেদের ব্যষ্টি-প্রকৃতিতে দেহের ক্রিয়া, মনের চিন্তা সৃষ্টি প্রভৃতি কাজে লাগাইতেছি। যদি বল—চিন্তা সৃষ্টি করা যায় না,

তাহা হইলে কুড়ি দিন না খাইয়া দেখ, কিরূপ বোধ হয়। ... চিন্তাও আমাদের ভুক্ত খাদ্য দ্বারাই উৎপন্ন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যে-প্রাণ সব কিছুকে চালাইতেছে, উহাকে আমাদের দেহের মধ্যে নিয়ন্ত্রণের নাম 'প্রাণায়াম'। সহজ বুদ্ধিতে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দেহের যাবতীয় ক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস। নিঃশ্বাস বন্ধ করিলে দেহের ব্যাপারও বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় শ্বাস লইলে ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তবে প্রাণায়ামের লক্ষ্য শ্বাস-নিরোধ মাত্র নয়, শ্বাসের পশ্চাতে এক সূক্ষ্মতর শক্তিকে বশে আনা।

জনৈক রাজা মন্ত্রীর প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া একটি উচ্চ গম্বুজের উপর তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ দেন। মন্ত্রীর স্ত্রী রাত্রে স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিলে মন্ত্রী বলিলেন, 'কান্নাকাটি করিয়া লাভ নাই বরং সুকৌশলে আমাকে একটি দড়ি পাঠাইয়া দিও।' মন্ত্রীপত্নী একট গুবরে পোকার একটি পায়ে একগাছি রেশমের সুতা বাঁধিয়া উহার মাথায় খানিকটা মধু মাখাইয়া উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। রেশমের সুতার সহিত প্রথমে খানিকটা মোটা সুতা এবং পরে মোটা টোয়াইন সুতার গুটি সংলগ্ন ছিল। টোয়াইনের গুটিটিতে বাঁধা ছিল একগাছি শক্ত মোটা দড়ি। মধুর গন্ধে পোকাটি ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল এবং ক্রমে বুরুজের মাথায় উঠিল। মন্ত্রী পোকাটি ধরিলেন এবং ক্রমশঃ সিল্কের সুতা, মোটা সুতা এবং টোয়াইনের সুতা ধরিয়া মোটা দড়িগাছিটি নীচ হইতে উপরে টানিয়া তুলিলেন এবং উহার সাহায্যে বুরুজ হইতে পলায়ন করিলেন। আমাদের দেহে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেন ঐ রেশমী সুতা। উহাকে আয়ত্ত করিলে ক্রমশঃ আমরা স্নায়ুমণ্ডলীরূপে মোটা সুতা এবং চিন্তারূপে টোয়াইনের সুতাকে ধরিতে পারি। অবশেষে আমরা হাতে পাই প্রাণরূপ শক্ত রজ্জু। প্রাণ-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আমরা মুক্তি লাভ করি।

জড়স্তরের বস্তুর সাহায্যে আমাদিগকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর অনুভূতিতে উপস্থিত হইতে হইবে বিশ্বজগৎ একটিই সত্তা, উহার যে বিন্দুতেই স্পর্শ কর না কেন, সব বিন্দুই ঐ এক বিন্দুরই হেরফের। একটি একতা সর্বত্র অনুস্যূত। অতএব শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে স্থূল ব্যাপারকে ধরিয়াও সূক্ষ্ম চৈতন্যকে অধিগত করা যায়।

এখন শরীরের যে-সব স্পন্দন আমাদের জ্ঞানগোচর নয়, প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা উহাদিগকে আমরা ক্রমশঃ অনুভব আরম্ভ করি। আর ঐ-সব স্পন্দন-অনুভবের সঙ্গে উহারা আমাদের বশে আসে। আমরা বীজাকারে নিহিত চিন্তাগুলিকে দেখিতে পাইব এবং উহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারিব। অবশ্য আমাদের সকলেরই যে ইহা সম্পাদনের সুযোগ বা ইচ্ছা বা ধৈর্য বা শ্রদ্ধা আসিবে তাহা নয়, তবে এই-সম্পর্কীয় সাধারণ জ্ঞানও প্রত্যেকের কিছু না কিছু উপকার সাধন করে।

প্রথম সুফল স্বাস্থ্য। আমাদের শতকরা নিরানব্বই জন যথাযথভাবে নিঃশ্বাস লই না। ফুসফুসে যথেষ্ট বাতাস আমরা টানিয়া লই না। ... শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়মিত করিতে পারিলে শরীর শুদ্ধ হয়, মন শান্ত হয় ...। লক্ষ্য করিয়া থাকিবে—মনের যখন শান্তি থাকে—তখন নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে এবং তালে তালে পড়িতে থাকে। সেইরূপ নিঃশ্বাসকে যদি স্থির ও ছন্দোবদ্ধ করা যায় তো মনেরও শান্তি আসে। অপরপক্ষে মন যখন উদ্বিগ্ন, তখন নিঃশ্বাসের তালও কাটিয়া যায়। অভ্যাসের দ্বারা নিঃশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে মনের শান্তি অবশ্যই সুলভ্য। মন যদি উত্তেজিত হয়, ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ কর এবং মনকে স্থির করিবার চেষ্টা না করিয়া দশ মিনিট তালে তালে নিঃশ্বাস লইতে থাক। দেখিবে মন শান্ত হইয়া আসিতেছে। এই ধরনের অভ্যাসগুলি হইল সাধারণ লোকের উপযোগী এবং উপকারী। অপরগুলি যোগীদের জন্য।

গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াগুলি ধাপমাত্র। বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য প্রায় চুরাশীটি আসন আছে। কেহ কেহ প্রাণায়ামকে জীবনের প্রধানতম অনুশীলনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নিঃশ্বাসের গতিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহারা কোন কাজই করেন না। সর্বদা তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে কোন্ নাকে বেশী শ্বাস বহিতেছে। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাসের গতি থাকিলে তাহারা কতকগুলি কাজ করিবেন, বামদিকে শ্বাস বহিলে অন্য কতকগুলি কাজ। যখন উভয় নাসাপথেই শ্বাসগতি সমান থাকে, তখন তাঁহারা ভগবদুপাসনা করেন। শ্বাসের এইরূপ অবস্থায় মনঃসংযম সহজ হয়। শ্বাসের দ্বারা দেহের স্নায়ুপ্রবাহকে ইচ্ছামত শরীরের যে

কোন অংশে চালিত করা যায়। কোন অঙ্গ পীড়িত হইলে প্রাণপ্রবাহ সেই অঞ্চলে নিয়োজিত করিয়া পীড়ার উপশম করা চলে।

আরও নানাপ্রকার যৌগিক ক্রিয়া প্রচলিত আছে। কতকগুলি সম্প্রদায় আছে, যাহারা শ্বাস-ব্যাপারকে থামাইয়া রাখিতে চায়। তাহারা এমন কিছু করিবে না, যাহাতে বেশী নিঃশ্বাস লইতে হয়। তাহারা একপ্রকার ধ্যানস্থ হইয়া থাকে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ তখন প্রায় সবই বন্ধ। হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনও একপ্রকার স্তব্ধ। ... এই সব ক্রিয়ায় খুব বিপদ আছে। আরও কতকগুলি কঠিন ক্রিয়ার উদ্দেশ্য উন্নততর যৌগিক শক্তি লাভ করা। কাহারও চেষ্টা থাকে—শ্বাসরুদ্ধ করিয়া শরীরকে হাল্কা করিয়া ফেলা। তখন তাহারা শূন্যে উঠিতে পারে। আমি কখনও কাহাকেও এইরূপ শূন্যে উঠিতে বা বাতাসে উড়িতে দেখি নাই। তবে যোগের পুঁথিতে এইরূপ ক্ষমতার উল্লেখ আছে। এই সকলের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভান আমি করিতে চাই না। তবে আমি অনেক আশ্চর্য যৌগিক ক্রিয়া দেখিয়াছি। ... একবার এক ব্যক্তিকে শূন্য হইতে ফল ও ফুল বাহির করিতে দেখিয়াছিলাম।

... যোগী যোগশক্তি দ্বারা স্বীয় দেহকে এত ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিতে পারেন যে, উহা এই দেওয়ালকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে। আবার তাঁহার শরীরকে এত ভারী করাও সম্ভব যে, দুই শত লোক তাঁহাকে তুলিতে পারিবে না। যদি ইচ্ছা করেন তো তিনি পাখীর ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবেন। কোন যোগীর কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতালাভ করা সম্ভব নয়। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে এক যোগী হয়তো সৃষ্টি করিতেন, অপর এক যোগী উহা ধ্বংস করিয়া দিতেন। ... যোগবিষয়ক গ্রন্থে এই-সকল কথা আছে। আমার নিজের পক্ষে এইসব বিশ্বাস করা কঠিন, তবে আমি অবিশ্বাসও করি না। নিজের চোখে যে-সব বিষয় দেখিয়াছি, সেইগুলিতে কোন সন্দেহ নাই।

জগতের জ্ঞান-আহরণ যদি সম্ভবপর হয় তো উহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা নয়, মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া। পাশ্চাত্যদেশীয়রা বলেন, 'ইহা আমাদের স্বভাব, আমরা উহা বদলাইতে পারি না।' কিন্তু এই প্রকার মনোভাব দ্বারা সামাজিক সমস্যার সমাধান হয় না, জগতেরও কোন উন্নতি ঘটে না।

বলবানরা সব কিছু গ্রাস করিয়া লইতেছে, দুর্বলেরা দুঃখভোগ করিতেছে। যাহার কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা

আছে, তাহার লোভেরও সীমা নাই। বঞ্চিতেরা ধনীর প্রতি প্রবল ঘৃণা লইয়া নিজেদের সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের হাতে যখন ক্ষমতা আসিবে, তখন তাহাদের আচরণও হইবে অনুরূপ। ইহাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার রীতি, অনিয়ন্ত্রিত ভোগপ্রবৃত্তির পরিণাম। সমস্যার সমাধান হইতে পারে শুধু মানুষের মনকে সুপরিচালিত করিয়া। ... মানুষ যাহা করিতে চায় না, তাহা তাহাকে আইনের জোরে করান যায় না। ...সে যদি আন্তরিক সৎ হইতে চায়, তবেই সে সৎ হইতে পারে। আইন-আদালত কখনও তাহাকে সৎ পথে আনিতে পারে না।

মানুষের মনেই সকল জ্ঞান। একটি পাথরে কে জ্ঞান দেখিয়াছে? জ্যোতির্বিদ্যা কি তারাগুলিতে? মানুষই জ্ঞানের আধার। আসুন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা অনন্ত শক্তিস্বরূপ। মনের ক্ষমতার সীমা কে টানিতে পারে? আমরা সকলেই সেই অনন্ত মনস্বরূপ, আসুন আমরা ইহা অনুভব করি। প্রত্যেকটি জলবিন্দুর সহিত সমগ্র সমুদ্রটি রহিয়াছে। মানুষের মন ঐ মহাসমুদ্রের মত। ভারত-মনীষা মনের এই শক্তি ও সম্ভাবনাগুলির আলোচনা করিয়াছে এবং উহাদের বিকাশসাধনে সে তৎপর। পূর্ণতার উপলব্ধি সময়-সাপেক্ষ। ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করা চাই। যদি পঞ্চাশ হাজার বৎসর লাগে, তাহাতেই বা কি? মানুষ যদি স্বেচ্ছায় তাহার মনের মোড় ফিরাইয়া পূর্ণতার অভিলাষী হয়, তবেই পূর্ণতার উপলব্ধি সম্ভবপর।

রাজযোগে বিঘোষিত সব বিষয়ে তোমাদের বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই। তবে একটি বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, উহা হইল মানুষের দেবত্বলাভের সামর্থ্য। মানুষ যখন তাহার নিজের মনের চিন্তাসমূহের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব অর্জন করে, তখনই ঐ দেবত্ব-বিকাশ সম্ভবপর। ... মনের ভাবনা ও ইন্দ্রিয়সমূহ আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, আমার চালক নয়– এইরূপ অবস্থা আসা চাই, তবেই সব অশুভ লোপ পাইবে।

মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়া ভরিয়া রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরূপ যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করিয়া তোলা এবং উহাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা—ইহাই হইল শিক্ষার আদর্শ। মনকে যদি একটি বিন্দুতে একাগ্র করিতে চাই, উহা সেখানে যাইবে; আবার যে মুহূর্তে আমি উহাকে ডাক দিব, উহা সেই বিন্দু হইতে যেন ফিরিয়া আসিতে পারে।

ইহাই বিষম সঙ্কট। অনেক কষ্টে আমরা কিছু একাগ্রতার শক্তি লাভ করি। মন কতকগুলি বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনাসক্তির ক্ষমতা আমরা অর্জন করি না। মনকে একটি বিষয় হইতে ইচ্ছামত টানিয়া আনিতে পারি না, এমন কি অর্ধেক জীবন দিতে রাজী হইলেও না।

মনকে একাগ্র করা ও বিযুক্ত করা—দুই ক্ষমতাই আমাদের থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি এই দুইটিতেই নিপুণ, তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছাড় খাইতেছে শুনিলেও তিনি দুঃখী হইবেন না। এইরূপ স্থিরতা কি পুঁথি পড়িয়া লাভ করা যায়? রাশি রাশি বই পড়িতে পার ... শিশুর মাধায় এক মুহূর্তে পনর হাজার শব্দ ঢুকাইয়া দিতে পার, যতকিছু মতবাদ, যতকিছু দর্শন আছে, সব তাহাকে শিখাইতে পার ... মাত্র একটি বিজ্ঞান আছে, যাহা দ্বারা মনের প্রভুত্ব লাভ করা যায়—মনোবিদ্যা ... প্রাণায়াম হইতেই ইহার আরম্ভ।

ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে মনের বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিতে পারা যায় এবং অবশেষে মন বশে আসে। ইহা সুদীর্ঘ অভ্যাসের ব্যাপার। হাল্কা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ইহা কখনই অভ্যাস করা উচিত নয়। যাহার যথার্থ আগ্রহ আছে, সে একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করে। রাজযোগ কোন বিশ্বাস, মতবাদ বা ঈশ্বরের কথা বলে না। যদি তোমার দুই হাজার দেবতার উপর আস্থা থাকে, বেশ তো ঐ বিশ্বাসের পথেই চল না। ক্ষতি কি? কিন্তু রাজযোগে পাওয়া যায় ব্যক্তি-সম্পর্কশূন্য তত্ত্ব।

মহা মুশকিল এই যে, আমরা বচন ও মতবাদ ঝাড়িতে বৃহস্পতি। কিন্তু এই বাক্যের বোঝা অধিকাংশ মানুষকে কোনই সাহায্য করে না। তাহাদের প্রয়োজন বাস্তব জিনিষের

সংস্পর্শ। বড় বড় দার্শনিক তত্ত্বের কথা বলিলে তাহারা ধারণা করিতে পারিবে না, তাহাদের মাথা গুলাইয়া যাইবে। সরল শ্বাসপ্রশ্বাসের অভ্যাসের কথা অল্প অল্প করিয়া শিক্ষা দিলে বরং তাহারা বুঝিতে পারিবে এবং অভ্যাস করিয়া আনন্দও পাইবে। ধর্মের ইহা প্রাথমিক পাঠ। শ্বাসপ্রশ্বাসের অভ্যাস দ্বারা প্রচুর উপকার হইবে। আমার মিনতি– আপনারা শুধু উপর উপর কৌতূহলী হইবেন না। কয়েকদিন অভ্যাস করিয়া দেখুন। যদি ফল না পান, আসিয়া আমাকে গালি দিবেন।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি পুঞ্জীভূত শক্তি। ঐ মহাশক্তি প্রতি বিন্দুতে বর্তমান। উহার এক কণাই আমাদের সকলের পক্ষে পর্যাপ্ত, যদি আমরা জানি কি করিয়া উহা আয়ত্ত করা যায়।

'অমুক কাজ আমাকে করিতেই হইবে' –এই বুদ্ধিই আমাদিগকে নষ্ট করিতেছে, ইহা ক্রীতদাসের বুদ্ধি। ... আমি তো চিরমুক্ত। আমার আবার কর্তব্যের বন্ধন কি? আমি যাহা করি, তাহা আমার খেলা। একটু আমোদ করিয়া লই ... এই পর্যন্ত।

প্রেতাত্মারা দুর্বল। তাহারা আমাদের নিকট হইতে কিছু প্রাণশক্তি পাইতে চেষ্টা করিতেছে।

একটি মন হইতে অপর মনে আধ্যাত্মিক তেজ সংক্রামিত করা যায়। যিনি দেন, তিনি গুরু; যে গ্রহণ করে, সে শিষ্য। এইভাবেই পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক শক্তি বিকীর্ণ হয়।

মৃত্যুর সময় ইন্দ্রিয়সমূহ মনে লয় পায়, মন লীন হয় প্রাণে। আত্মা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় মন ও প্রাণের খানিকটা অংশ সঙ্গে লইয়া যান। সূক্ষ্ম-দেহের ধারক হিসাবে কিছু সূক্ষ্ম উপাদানও নেন। কোন প্রকার বাহন ব্যতীত প্রাণ থাকিতে পারে না। ... প্রাণ সংস্কারসমূহে আশ্রয় পায়। নূতন শরীর পরিগ্রহ কালে উহা পুনরায় পৃথক্ হয়। যথাকালে নূতন দেহ ও নূতন মস্তিষ্ক নির্মিত হয়। আত্মা উহার মাধ্যমে পুনরায় অভিব্যক্ত হন।

প্রেতাত্মারা শরীর সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে যাহারা খুব দুর্বল, তাহারা যে দেহ ত্যাগ করিয়াছে, তাহাই স্মরণ করিতে পারে না। তাহারা অপর মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া পৃথিবীর কিছু ভোগসুখ লাভ করিবার চেষ্টা করে। যে-কেহ ঐ প্রেতাত্মাদের

প্রশ্রয় দেয়, তাহাদের সমূহ বিপদ ঘটিতে পারে, কেননা প্রেতাত্মারা তাহার জীবনীশক্তি শোষণ করে।

এই জগতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই চিরন্তন নয়। ... মুক্তি- অর্থে সত্যকে জানা। আমরা নূতন কিছু হই না, আমরা যাহা তাহাই থাকি। আত্মসত্যে শ্রদ্ধা আনিতে পারিলেই মুক্তি সম্ভব, কর্ম দ্বারা নয়; ইহা জ্ঞানের প্রশ্ন। তুমি কে—ইহা তোমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, আর কিছু নয়। সংসার-স্বপ্ন তৎক্ষণাৎ ঘুচিয়া যাইবে। তোমরা এবং অন্যান্য সকলে এই পৃথিবীতে নানা স্বপ্ন দেখিয়া চলিয়াছ। মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া আবার নূতন এক স্বপ্ন দেখা শুরু হইবে। ঐ স্বপ্ন চলিবে কিছুকাল। উহার অবসান ঘটিলে পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে আসা—হয়তো খুব সদ্‌ভাবে জীবনযাপন, অনেক দান-ধ্যান। কিন্তু তাহা তো আর আত্মজ্ঞান আনিয়া দিবে না। প্রকৃত দান অর্থে হাসপাতাল নির্মাণ নয়—ইহা আমরা কবে বুঝিব?

বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, 'সকল বাসনা আমা হইতে চলিয়া গিয়াছে। আমি আর ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে যাইব না।' তিনি তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়াসী হইয়া কঠোর সাধনায় লাগিয়া যান। অবশেষে একদিন দেখিতে পান—এই জগদ্‌বৈচিত্র্য কী মিথ্যা কল্পনা, কী দুঃস্বপ্ন, আর স্বর্গ বা লোক-লোকান্তরের প্রসঙ্গ আরও নিকৃষ্টতর ফাঁকি!—তখন তিনি হাসিয়া উঠেন।

৩. যোগের মূল সত্য

৫ এপ্রিল, ১৯০০, সান্ ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত।

ধর্মের অভ্যাস সম্বন্ধে কাহারও ধারণা নির্ভর করে—সে নিজে কার্যকারিতা বলিতে কি বুঝে এবং কোন্ দৃষ্টিকোণ হইতে সে শুরু করিতেছে, তাহার উপর। তিন ভাবেই আমরা ধর্মের অভ্যাস করিতে পারি—কর্মকে অবলম্বন করিয়া, পূজাপ্রণালীর মাধ্যমে কিম্বা জ্ঞানবিচার দ্বারা।

যিনি দার্শনিক, তিনি চিন্তা করিয়া চলেন ...। বন্ধন ও মুক্তির পার্থক্য—জ্ঞান ও অজ্ঞানের তারতম্য হইতেই ঘটে। দার্শনিকের লক্ষ্য হইল সত্যের উপলব্ধি, তাঁহার নিকট ধর্মের ব্যবহারিক উপযোগিতার অর্থ তত্ত্বজ্ঞানলাভ। যিনি উপাসক, তাঁহার ব্যবহারিক ধর্ম হইল ভক্তি ও ভালবাসার ক্ষমতা। কার্যকর ধর্ম বলিতে কর্মী বুঝেন—সৎ কাজ করিয়া যাওয়া। অন্যান্য প্রত্যেক বিষয়ের মত ধর্মের ক্ষেত্রেও আমরা প্রায়ই অপরের আদর্শের কথা মনে রাখি না। সারা পৃথিবীকে আমরা আমাদের নিজেদের আদর্শে বাঁধিতে চাই।

হৃদয়বান্ ব্যক্তির ধর্মাচরণ হইল—মানুষের উপকার-সাধন। যদি কেহ হাসপাতাল-নির্মাণে তাঁহাকে সাহায্য না করে, তাহা হইলে তাঁহার মতে সে একান্তই অধার্মিক। কিন্তু সকলকেই যে উহা করিতে হইবে, তাহার কোন যুক্তি আছে কি? দার্শনিকও এইরূপে যে-কেহ তত্ত্বজ্ঞানের ধার ধারে না, তাহাকে হয়তো প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করিতে থাকিবেন। কেহ কেহ হয়তো বিশ হাজার হাসপাতাল নির্মাণ করিয়াছে, দার্শনিক ঘোষণা করিবেন, উহারা তো দেবতাদের ভারবাহী পশু। উপাসকেরও কার্যকর ধর্ম সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা ও আদর্শ রহিয়াছে। তাঁহার মতে যাহারা ভগবানকে ভালবাসিতে পারে না, তাহারা যত বড় কাজই করুক না কেন, ভাল লোক নয়। যোগী মনঃসংযম এবং অন্তঃপ্রকৃতির জয়ে উদ্যোগী। তাঁহার প্রশ্ন শুধুঃ ঐ দিকে কতটা আগাইয়াছ? ইন্দ্রিয় ও দেহের উপর কতটা

আধিপত্য লাভ করিয়াছ? আমরা যেমন বলিয়াছি, ইঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী অপরের বিচার করিয়া থাকেন।

আমরা সর্বদাই ব্যবহারিক ধর্মের কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু এই ব্যবহারিকত্ব আমাদের নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী হওয়া চাই, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশসমূহে। প্রোটেষ্টাণ্টদের আদর্শ হইল সৎকর্ম। তাঁহারা ভক্তি বা দার্শনিক জ্ঞানের বড় ধার ধারেন না, তাঁহারা মনে করেন, উহাতে বেশী কিছু নাই। 'তোমার আধ্যাত্মিক জ্ঞান আবার কি? মানুষের কিছু কর্ম করা চাই'—ইহাই হইল তাঁহাদের মনোভাব। ... মানবহিতৈষণার একটু ছিটাফোঁটা! গীর্জাসমূহ তো মুখে দিবারাত্র সহানুভূতিহীন অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধে গালিবর্ষণ করিতেছে, কিন্তু তবুও মনে হয় কার্যতঃ উহারই দিকে তাহারা দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। নীরস উপযোগবাদের ক্রীতদাস! উপযোগিতার ধর্ম! বর্তমানে তো দেখা যাইতেছে—এই ভাবটিই খুব প্রবল। আর এইজন্যই পাশ্চাত্যে কোন কোন বৌদ্ধমত খুব জনপ্রিয় হইতেছে। ঈশ্বর আছেন কিনা, আত্মা বলিয়া কিছু আছে কিনা, তাহা তো সাধারণ মানুষের জ্ঞানগোচর নয়, অথচ জগতে অশেষ দুঃখ। অতএব জগতের কল্যাণচিকীর্ষাই প্রত্যক্ষ নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য যোগ-মতের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু এরূপ নয়। ইহা বলে যে, মানুষের আত্মা সত্যই আছে এবং উহারই মধ্যে সকল শক্তি নিহিত রহিয়াছে। আমরা যদি শরীরকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিতে পারি, তাহা হইলে অন্তরের ঐ শক্তি বিকশিত হইবে। আত্মাতেই সকল জ্ঞান। মানুষের এত সংগ্রাম কেন? দুঃখের উপশমের জন্য ...। শরীরের উপর আমাদের আধিপত্য নাই বলিয়াই আমরা যত দুঃখ ভোগ করি। আমরা অশ্বের পুরোভাগে শকটটিকে যুতিয়া দিতেছি। উদাহরণস্বরূপ সৎকর্মের কথা ধরা যাক।

আমরা ভাল কাজ করিতে চেষ্টা করিতেছি ... দরিদ্রের সেবা করিতেছি। কিন্তু আমরা দুঃখের মূল কারণের দিকে দৃষ্টিপাত করি না। ইহা যেন একটি বালতি লইয়া সাগরের জল ছেঁচিতে যাওয়া—যেটুকু জল খালি করা গেল, তাহার চেয়ে অনেক বেশী জল সর্বক্ষণ হাজির হইতেছে! যোগী দেখেন, ইহা অর্থহীন প্রচেষ্টা। তিনি বলেন, দুঃখ হইতে

পরিত্রাণের উপায় হইল—প্রথমে দুঃখের মূল অন্বেষণ। ... ব্যাধি যদি দুশ্চিকিৎস্য হয়, তাহা হইলে উহা আরোগ্য করার চেষ্টা নিরর্থক। জগতে এত দুঃখ কেন? আমাদেরই নির্বুদ্ধিতার জন্য। আমরা আমাদের শরীরকে আয়ত্ত করি নাই। যদি নিজের দেহের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পার তো জগতের সকল দুঃখ দূর হইবে। প্রত্যেকটি হাসপাতাল চায়, বেশী বেশী রোগী যেন আসে। যতবার তুমি কিছু দান করিবার কথা ভাবিতেছ, ততবারই তোমাকে—তোমার দান যে গ্রহণ করিবে, সেই ভিক্ষুকের কথাও ভাবিতে হয়। যদি বল, 'হে ভগবান্, পৃথিবী যেন দানশীল ব্যক্তিতে ভরিয়া যায়'—তোমার কথার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, পৃথিবী যেন ভিক্ষুকের দ্বারাও পরিপূর্ণ হয়। লোকহিতকর কাজে যদি জগৎ পরিব্যাপ্ত দেখিতে চাও তো জগৎকে দুঃখকষ্টে পরিপূর্ণ দেখিতেও প্রস্তুত থাকিও।

যোগী বলেন, দুঃখের কারণ কি—তাহা প্রথমে বুঝিলে ধর্মের ব্যবহারিক উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম হয়। জগতের যাবতীয় দুঃখ আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট। সূর্য, চন্দ্র অথবা তারাসমূহের কি ব্যাধি আছে? যে আগুন দিয়া ভাত রাঁধিতেছ, উহাই শিশুর হাত দগ্ধ করিতে পারে। উহা কি আগুনের দোষ? অগ্নি ধন্য, এই বিদ্যুৎশক্তি ধন্য, ইহারা আলোক দিতেছে। ... কোথাও তুমি দোষ চাপাইতে পার না। মূল ভূতগুলির উপরও না। জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়, জগৎ জগৎই। আগুন আগুনই, উহাতে যদি তুমি হাত পোড়াও, সে তোমারই বোকামি। যদি আগুনকে রন্ধন এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির কাজে লাগাইতে পার তো তুমি বিজ্ঞ। ইহাই পার্থক্য; কোন অবস্থা-বিশেষকে কখনও ভাল বা মন্দ বলা চলে না। ভাল বা মন্দ ব্যক্তি-মানবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জগৎকে ভাল বা মন্দ বলার কোন অর্থ আছে কি? ইন্দ্রিয়পরবশ ব্যক্তি-মানবই সুখ বা দুঃখের অধীন হয়।

যোগীরা বলেনঃ প্রকৃতি ভোগ্য, আত্মা ভোক্তা। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গুলির স্পর্শ হইতেই সুখ বা দুঃখ, শীত বা উষ্ণের জ্ঞান হয়। আমরা যদি ইন্দ্রিয়গুলি আয়ত্ত করিতে পারি এবং এখন যেমন সেগুলি আমাদিগকে চালাইতেছে, সেইরূপ না হইয়া যদি আমরা তাহাদিগকে খুশীমত চালাইতে পারি, আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য করিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে

তৎক্ষণাৎ সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। বর্তমান অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে এবং আমাদিগকে খেলাইয়া বেড়াইতেছে, সর্বদাই বোকা বানাইতেছে।

ধরুন এখানে একটি দুর্গন্ধ রহিয়াছে। উহা আমার নাকের সংস্পর্শে আসিলে আমি বিরক্তবোধ করিব। আমি যেন আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গোলাম। তাহা যদি না হইতাম, তাহা হইলে আমি ঐ দুর্গন্ধের পরোয়া করিতে যাইব কেন? একজন আমাকে কটুকথা বলিল। উহা আমার কানে ঢুকিয়া দেহ ও মনের মধ্যে রহিল। আমি যদি আমার দেহেন্দ্রিয় মনের প্রভু হই, তাহা হইলে আমি বলিব, 'ঐ শব্দগুলি চুলোয় যাক, আমার কাছে ঐগুলি কিছুই নয়, আমার কোন কষ্ট নাই, আমি গ্রাহ্য করি না।' ইহাই হইল পরিষ্কার সরল সহজ সত্য।

প্রশ্ন উঠিতে পারেঃ ইহা কি কাজে পরিণত করা যায়? মানুষ কি নিজের দেহমনকে এই ভাবে জয় করিতে পারে? ... যোগবলে ইহা অবশ্যই সম্ভব। ... যদি না-ও হয়, যদি তোমার মনে সংশয় থাকে, তবু তোমাকে চেষ্টা করিতে হইবে। নিষ্কৃতির অন্য পথ নাই।

তুমি সর্বদা সৎ কাজ করিয়া যাইতে পার, তথাপি তোমার ইন্দিয়সমূহের দাসত্ব ঘুচিবে না, তোমাকে সুখ-দুঃখের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে; হয়তো তুমি প্রত্যেক ধর্মের দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছ। এদেশে তো লোকে গাদা গাদা বই লইয়া ফিরে। তাহারা পণ্ডিত মাত্র, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। সুখদুঃখ-বোধ তাহাদের অবশ্যম্ভাবী। তাহারা দুই-হাজার বই পড়িতে পারে, তাহাতে বলিবার কিছু নাই, কিন্তু যেই একটু কষ্ট আসিল, তাহাদের দুর্ভাবনার আর অন্ত থাকে না। ... ইহাকে কি মনুষ্যত্ব বল? ইহা তো চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

মানুষ আর পশুতে প্রভেদ কি? ... আহার, নিদ্রা, ভয় ও বংশবিস্তার তো সকল প্রাণীর সাধারণ ধর্ম। মানুষের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এই যে, সে এগুলি আয়ত্ত করিতে পারে এবং এগুলির উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। পশুর পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। পরোপকার-সাধনে মানুষের বিশেষ কি কৃতিত্ব? ইতরপ্রাণীও পরোপকার করিতে পারে। পিপীলিকা, কুকুর—ইহাদের মধ্যেও উহা দেখা গিয়াছে। মানুষের স্বাতন্ত্র্য

হইল আত্মজয়ে। কোন কিছুর সংস্পর্শ-জনিত প্রতিক্রিয়াকে সে বাধা দিতে পারে। ইতরপ্রাণীর এই সামর্থ্য নাই। সর্বত্র সে প্রকৃতির রজ্জু দ্বারা বাঁধা। মানুষ প্রকৃতির অধীশ্বর, পশু প্রকৃতির ক্রীতদাস—ইহাই হইল একমাত্র প্রভেদ। প্রকৃতি কি?—পঞ্চেন্দ্রিয় ...।

যোগমতে অন্তঃপ্রকৃতি-জয়ই নিষ্কৃতির পথ। ... ভগবানের জন্য ব্যাকুলতাই ধর্ম। ...সৎকর্ম প্রভৃভি মনকে একটু স্থির করে—এই মাত্র। যোগাভ্যাস—পূর্ণতার উপলব্ধি আমাদের পূর্বসংস্কারের উপর নির্ভর করে। আমি তো সারাজীবন ইহাই অনুশীলন করিতেছি, তবু এখন পর্যন্ত সামান্যই আগাইতে পারিয়াছি। তবে ইহাই যে একমাত্র খাঁটি পথ, তাহা বিশ্বাস করিবার মত সুফল আমি পাইয়াছি। এমন দিন আসিবে, যখন আমি আমার নিজের প্রভু হইতে পারিব। এ জন্মে না হয় তো অপর এক জন্মে নিশ্চয়ই ইহা ঘটিবে। চেষ্টা আমি কখনও ছাড়িব না। কিছুই নষ্ট হইবার নয়। এই মুহূর্তে যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার সমুদয় অতীত সাধনা আমার সঙ্গে যাইবে। মানুষে মানুষে পার্থক্য কিসে হয়? তাহার পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা। অতীত অভ্যাস একজনকে করে মনস্বী এবং অপরকে করে নির্বোধ। অতীতের অর্জিত শক্তি থাকিলে তুমি পাঁচ মিনিটেই হয়তো কোন কাজ সিদ্ধ করিবে। শুধু বর্তমান দেখিয়া কোন কিছু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। আমাদের প্রত্যেককেই কোন না কোন সময়ে পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে।

যোগীরা ব্যবহারিক যে-সব অভ্যাস শিক্ষা দেন, সেগুলির অধিকাংশই মনকে লইয়া—একাগ্রতা ধ্যান ইত্যাদি। আমরা এত জড়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছি যে, নিজেদের বিষয় চিন্তা করিলে আমরা কেবল আমাদের শরীরটিই দেখি। দেহই আমাদের আদর্শ হইয়াছে, আর কিছু নয়। অতএব শারীরিক কিছু অবলম্বনের দরকার।

প্রথম, আসন। এমন একটি ভঙ্গীতে বসিতে হইবে, যে-অবস্থায় অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকা যায়। শরীরের স্নায়ুপ্রবাহগুলি মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। মেরুদণ্ড শরীরের ভার ধারণ করিবার জন্য নয়। অতএব এমন আসনে বসা প্রয়োজন, যাহাতে দেহের ওজন মেরুদণ্ডের উপর না পড়ে। মেরুদণ্ডকে সকল চাপ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে।

আরও কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় আছে। খাদ্য ও ব্যায়ামের গুরুতর প্রশ্নটি উল্লেখযোগ্য।

খাদ্য খুব সাদাসিধা হওয়া উচিত। মাত্র একবার বা দুইবারে দিনের সমগ্র আহার্য উদরসাৎ না করিয়া অল্পমাত্রায় কয়েকবার খাওয়া ভাল। কখনও ক্ষুধা-পীড়িত হইও না। যিনি অত্যধিক ভোজন করেন, তিনি যোগী হইতে পারেন না। যিনি বেশী উপবাস করেন, তাঁহারও পক্ষে যোগ কঠিন। অতিমাত্রায় নিদ্রা বা অধিক রাত্রি জাগরণ, একেবারে কাজ না করা বা অত্যন্ত পরিশ্রম করা—এগুলিও যোগের অনুকূল নয়।৬ যোগে সাফল্যের জন্য নিয়মিত আহার ও পরিশ্রম, নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণ—এই-সব প্রয়োজন। যথাযোগ্য খাদ্য কি, তাহা নিজেদেরই স্থির করিতে হইবে। অপর কেহ উহা বলিয়া দিতে পারে না। একটি সাধারণ বিধি এই যে, উত্তেজক খাদ্য বা বেশী মশলা-দেওয়া রান্না বর্জনীয়। ... আমাদের কাজের পরিবর্তনের সহিত খাদ্যেরও যে পরিবর্তন আবশ্যক, তাহা আমরা লক্ষ্য করি না। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, আমাদের যত কিছু সামর্থ্য, তাহা আমরা খাদ্য হইতেই লাভ করিয়া থাকি।

অতএব যে পরিমাণে ও যে ধরনের শক্তি আমরা চাই, আমাদের আহার্যও তদনুযায়ী নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে। ...

প্রচণ্ড ব্যায়ামের কোন প্রয়োজন নাই। ... মাংসল শরীর যদি চাও, যোগ তোমার জন্য নয়। বর্তমানে যে দেহ আছে, তাহা অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্মতর একটি যন্ত্র নির্মাণ করিতে হইবে। গুরুতর কায়িক পরিশ্রম যোগের পক্ষে খুবই অনিষ্টকর। ... যাহাদিগকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এমন লোকের ভিতর বাস করিও। প্রচণ্ড মেহনত না করিলে দীর্ঘায়ু হইতে পারিবে। অপরিমিত-ভাবে জ্বালাইলে প্রদীপ যেমন পুড়িয়া যায়, সেইরূপ মাংসপেশীকে বেশী মাত্রায় খাটাইলে উহার ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়। যাহারা মস্তিষ্কের কাজ করে, তাহারা অনেক কাল বাঁচে। ... প্রদীপকে ধীরে ধীরে এবং মৃদুভাবে জ্বলিতে দাও। বেশী জ্বালাইয়া শীঘ্র শীঘ্র উহা পুড়াইয়া ফেলিও না। প্রত্যেকটি উদ্বেগ, প্রত্যেকটি উদ্দাম

লম্ফ-ঝম্প—শারীরিক অথবা মানসিক যাহাই হউক—তোমার আয়ুকে ক্ষয় করিতেছে, মনে রাখিও।

যোগীরা বলেন, প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুযায়ী তিন প্রকারের মন আছে। প্রথম— তামস মন, উহা আত্মার আলো ঢাকিয়া রাখে। দ্বিতীয়—রাজসিক মন, যাহা মানুষকে খুব কর্মব্যস্ত রাখে। তৃতীয়—সাত্ত্বিক মন, উহার লক্ষণ হইল স্থিরতা ও শান্তি।

এমন লোক আছে, যাহাদের জন্ম হইতেই সর্বক্ষণ ঘুমাইবার ধাত; তাহাদের রুচি— পচা বাসী খাদ্যে। যাহারা রজোগুণী, তাহারা ঝাল ও ঝাঁজযুক্ত খাদ্য পছন্দ করে। ... সাত্ত্বিক লোক খুব চিন্তাশীল, ধীর ও সহিষ্ণু প্রকৃতির হয়; তাহারা অল্প পরিমাণে খায় এবং কখনও উগ্র দ্রব্য খায় না।

লোকে আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, 'মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিব কি?' আমার গুরুদেব বলিতেন, 'তুমি কোন কিছু ছাড়িতে যাইবে কেন? উহাই তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে।' তুমি নিজে প্রকৃতির কিছুই বর্জন করিতে যাইও না, নিজেকে বরং এমন করিয়া গড়িয়া তোল, যাহাতে প্রকৃতি নিজেই তোমার নিকট হইতে সরিয়া যাইবে। এমন এক সময় আসিবে, যখন তোমার পক্ষে মাংস খাওয়া স্বভাবতই সম্ভব হইবে না। উহা দেখা মাত্রই তোমার ঘৃণার উদ্রেক হইবে। এমন দিন আসিবে, যখন এখন যে-সব জিনিষ ছাড়িবার জন্য তীব্র চেষ্টা করিতেছ, সেগুলি আপনা হইতেই বিরস ও ন্যক্কারজনক মনে হইবে।

শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের নানা প্রণালী আছে। একটি অভ্যাস করিতে হয় তিন ধাপে—নিঃশ্বাস টানিয়া লওয়া, নিঃশ্বাসকে রুদ্ধ রাখা এবং উহা ছাড়িয়া দেওয়া। কতকগুলি প্রণালী বেশ কঠিন। কতকগুলি জটিল প্রণালী যথাযোগ্য আহার্য বিনা অভ্যাস করিতে গেলে খুবই বিপজ্জনক হইতে পারে। যেগুলি খুব সরল, সেইগুলি ছাড়া অন্য প্রণালীগুলি তোমাদিগকে আমি অভ্যাস করিতে পরামর্শ দিব না।

একটি গভীর নিঃশ্বাস লইয়া ফুসফুস পরিপূর্ণ কর। ধীরে ধীরে উহা ছাড়িয়া দাও। এইবার এক নাকে শ্বাস টানিয়া ধীরে ধীরে অপর নাক দিয়া উহা বাহির করিয়া দাও। আমাদের

কেহ কেহ পুরা শ্বাস লইতে পারি না, কেহ কেহ বা ফুসফুসকে যথেষ্ট বাতাস ভরিয়া দিতে সমর্থ নই। উপরি-উক্ত অভ্যাসগুলি এই ত্রুটি বেশ সংশোধন করিবে। সকালে ও সন্ধ্যায় আধঘণ্টা করিয়া অভ্যাস করিতে পারিলে তুমি নূতন মানুষ হইয়া যাইবে। এই ধরনের শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ আদৌ বিপজ্জনক নয়। অন্যান্য অভ্যাসগুলি আস্তে আস্তে আয়ত্ত করিতে হয়। নিজের শক্তি আন্দাজ করিয়া চলিবে। দশ মিনিট যদি ক্লান্তিকর লাগে তো পাঁচ মিনিট করিয়া কর।

যোগীকে নিজের শরীর সুস্থ রাখিতে হইবে। এই-সব প্রাণায়াম শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণে প্রচুর সহায়তা করে। দেহের সর্বত্র বায়ুপ্রবাহে যেন ভরিয়া যায়। নিঃশ্বাস-গতি দ্বারা আমরা সকল অঙ্গের উপর প্রভুত্ব লাভ করি। শরীরের কোথাও অসাম্য ঘটিলে স্নায়ুপ্রবাহ ঐ দিকে চালিত করিয়া উহা আয়ত্তে আনিতে পারা যায়। যোগী বুঝিতে পারেন, শরীরের কোন্ স্থানে কখন প্রাণশক্তির ন্যূনতাবশতঃ যন্ত্রণা হইতেছে। তাহাকে তখন প্রাণসাম্য দ্বারা ঐ ন্যূনতা দূর করিয়া দিতে হয়।

যোগসিদ্ধির একটি অন্যতম শর্ত হইল পবিত্রতা। সকল সাধনের ইহাই মূল ভিত্তি। বিবাহিত বা অবিবাহিত সকলের পক্ষেই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা প্রয়োজন। ইহা অবশ্য একটি দীর্ঘ আলোচনার বিষয়, তবে আমি তোমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। সর্বসাধারণের কাছে এই বিষয়ের আলোচনা এদেশে রুচিসম্মত নয়। পাশ্চাত্য দেশগুলি লোক-শিক্ষকের ছদ্মবেশে একশ্রেণীর অতি হীন ব্যক্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। ইহারা নরনারীকে উপদেশ দেয় যে, যদি তাহারা যৌন-সংযম অভ্যাস করে তো তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইবে। এই-সব তথ্য ইহারা কোথায় পাইল? ... আমার নিকট এই প্রশ্ন লইয়া বহু লোক আসে। তাহাদিগকে কেহ বলিয়াছে যে, পবিত্র জীবন যাপন করিলে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে। ... এই-সব শিক্ষক ইহা জানিল কিরূপে? তাহারা নিজেরা ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছে কি? এই অপবিত্র নির্বোধ কামুক পশুরা সমগ্র জগৎকে তাহাদের পর্যায়ে টানিয়া আনিতে চায়!

আত্মত্যাগ বিনা কিছুই পাওয়া যায় না। ... মানব-চেতনায় যাহা পবিত্রতম—মহত্তম বৃত্তি, তাহাকে কলুষিত করিও না। ... পশুস্তরে উহাকে নামাইয়া আনিও না। নিজদিগকে ভদ্র করিয়া তোল। ... হও শুচি, হও পবিত্র। ... অন্য পথ নাই। যীশুখ্রীষ্ট কি অপর কোন পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন? ... যদি তোমার যৌনশক্তিকে রক্ষা করিয়া যথাযথ প্রয়োগ করিতে পার, তাহা হইলে উহা তোমাদিগকে ভগবানের নিকট লইয়া যাইবে। ইহার বিপরীত যাহা আসিবে, তাহা নরকতুল্য।

বাহিরের ব্যাপারে কিছু করা অনেক সহজ, কিন্তু পৃথিবীর যিনি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, তিনিও যখন মনঃসংযম করিতে যান, তখন নিজেকে শিশুর ন্যায় অসহায় বোধ করেন। অন্তঃসাম্রাজ্য জয় করা আরও বেশী কঠিন। তবে নিরাশ হইও না। উঠ জাগ, লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত চেষ্টা হইতে বিরত হইও না।